সমাজকল্যাণ বার্তা

জুলাই- সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ ইং

শরৎ, তোমার শিশির ধোওয়া কুন্তলে—
বনের পথে লুটিয়ে পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।

চতুর্থ সংখ্যা

জুলাই—সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ ইং

আষাঢ়—ভাদ্র, ১৩৮৯ বাং

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা	১
১। ইতিহাস কাঁদে .. .. —বিশ্বজিত সিংহ	৩
২। জনশক্তি উন্নয়নে সমাজ কল্যাণ .. —সাহেদা আহমেদ	৪
৩। পিকু বড় একা .. .. —কাজী মামুন	৭
৪। শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প .. —সাজনা শহীদ চৌধুরী	১৪
৫। বিচ্ছিন্ন ভাবনা .. .. —সত্য সন্ধানী	১৬
৬। পাঠকের দৃষ্টিতে 'সমাজ কল্যাণ' ..	২১

প্রচ্ছদ ফটো : আক্কাস

প্রকাশনায় : সমাজ কল্যাণ বিভাগ
৭৪, বিজয় নগর, ঢাকা।

সমাজ কল্যাণ

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ☐ সমাজ জীবনের বিভিন্নমুখী সমস্যা ও তার সমাধানমূলক প্রবন্ধ বা নাটক কিম্বা সমাজ কর্মীগণের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার আলোকে লেখা/রচনা পাঠালে সাগ্রহে গৃহীত হবে।
- ☐ লেখার অনুলিপি রেখে পাঠাবেন। কোন লেখা ফেরৎ দেওয়া বা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়।
- ☐ লিখবেন কালিতে। প্রকাশের জন্য পেন্সিলে লেখা কখনই বিবেচিত হবে না।
- ☐ কাগজের এক পিঠে স্পষ্টাক্ষরে লিখবেন। পোষ্ট কার্ডে পাঠানো লেখা বিবেচিত হবে না।
- ☐ লেখার শেষ পৃষ্ঠায় নিজের পুরো নাম, ঠিকানা লিখে পাঠাবেন। ছদ্ম নাম ব্যবহার করলেও পুরো নাম ঠিকানা দিতে হবে।
- ☐ প্রয়োজনে প্রতিটি লেখা ও চিঠি সম্পাদনা, পরিবর্জন ও পরিমার্জনের অধিকার সম্পাদকীয় দফতরের থাকবে।
- ☐ লেখার শেষ পৃষ্ঠায় নিজের পুরো নাম, ঠিকানা না থাকলে তা বাতিল করা হবে।
- ☐ "সমাজ কল্যাণ" সম্বন্ধে যে কোন প্রকারের মতামত গৃহীত হবে। তবে প্রতিবাদ বিতর্ক এবং সুষ্ঠু গঠনমূলক আলোচনা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু লেখকরা ভাষায় ব্যক্তিগত আলোচনা করবেন না।
- ☐ লেখা পাঠিয়ে অধৈর্য্য হয়ে অকারণ তাগাদা দেবেন না। লেখা সম্পর্কে কোন বক্তব্য বা মতামত জানানো সম্ভব নয়।
- ☐ লেখা বিবেচনাধীন থাকলে বা মনোনীত হলে তা কবে প্রকাশিত হবে সে সম্পর্কে কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়।
- ☐ লেখার সাথে অনেকেই ফটো পাঠান। ফটো গ্লসি পেপারে হাফ সাইজে পাঠাবেন। প্রত্যেক ফটোর পেছনে স্পষ্টাক্ষরে ক্যাপশান লিখে দেবেন। ফটোগ্রাফারের নামও উল্লেখ করতে পারেন।
- ☐ একই লেখা "সমাজ কল্যাণ" এবং অন্যত্র পাঠালে অনুগ্রহ করে এই দপ্তরে জানিয়ে দেবেন।
- ☐ সমাজ কল্যাণমূলক কোন কার্যরত ধরনের ছবিও আমাদের ঠিকানায় প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারবেন।
- ☐ সব রকম যোগাযোগের জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন:

"সমাজ কল্যাণ"
সমাজ কল্যাণ বিভাগ
(প্রকাশনা শাখা)
৭৪, বিজয় নগর, ঢাকা-২

আমাদের কথা

এক ট্রেনের কামরায় তিনজন যাত্রী রিজার্ভেশনে যাচ্ছেন। তিনজনই একটু গুরুগম্ভীর ভাবুক প্রকৃতির। খুব নিরিবিলিতে শূন্য কামরায় ভ্রমণের সুখ উপভোগ করতে করতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে চান। তিনজনের একজন লম্বা জোব্বা পরিহিত শুভ্র শ্মশ্রু মণ্ডিত সৌম্য চেহারার মানুষ। দ্বিতীয় জন জোয়ান, শক্ত-সামর্থ পেশীর স্বাস্থ্যবান মানুষ। তৃতীয় জন ছোট-খাট, একটু রুক্ষ চেহারার শুকনো মানুষ। তিন জনই নীরব ভাবনায় মশগুল। ভোরে অত্যন্ত মৃদু ঝির ঝিরে বাতাস বইছে। আঁধো আলো আঁধো আঁধারিতে বাইরে ধান ক্ষেতের আড়ালে থেকে এই মৃদু মিষ্টি বাতাসকে আকর্ষণীয় করে তুলছে একটি পাখির মিষ্টি গান। একটি দোয়েল থেকে থেকে সুললিত তানে দীর্ঘলয়ে পরপর তিনটে করে শিস দিচ্ছিল। প্রথম টানটি বেশ দীর্ঘ। দ্বিতীয়টি হ্রস্বতর, তৃতীয় শিসটি যেন হঠাৎ করে থমকে থেমে যাচ্ছে। চারিদিকে সব নিস্তব্ধ। দোয়েলটি আপন মনে গেয়ে যাচ্ছে। তিন জনই মোহিত হয়ে শুনছেন। তিনজন যাত্রীর একজন বলে উঠলেন: "বলুনতো পাখিটি কি বলছে"? খর্বাকৃতি লোকটি টেনে টেনে পাখিটির মতই দীর্ঘলয়ে বললেন, পাখিটি বলছে পেঁ——আ——জ, র—সু—ন, আদরক্। স্বাস্থ্যবান লোকটি বললেন না আপনি ঠিক বোঝেন নি পাখী বলছে, ড——ন, কুস্তি——কসরৎ।

মাওলানা সাহেব তীব্র প্রতিবাদ করে উঠলেন, না না পাখী ওসব কিছু বলছেনা। গাছপালা, পশু পাখী সব অহরহ আল্লাহর এবাদত করে। তাঁরা পার্থিব এসব বিষয় বস্তুর ধার ধারে না। পাখী বলছে এ——লা——হী——তে——রী——কুদরৎ।

খর্বাকৃতি লোকটি ছিলেন পেশাগত জীবনে একজন বাবুর্চি। সুতরাং তাঁর চিন্তাধারা মশলা এবং খাদ্য বস্তুকে ঘিরে। পাখীর সুমধুর তানটি তার ভাবনায় পেঁয়াজ, রসুন আদরককে পর্যবসিত হলো।

স্বাস্থ্যবান লোকটি ছিলেন একজন কুস্তিগীর। দোয়েলের গানটি তাঁর চিন্তায় পর্যবসিত হলো ডন, কুস্তি কসরতে।

সৌম্য চেহারার ব্যক্তি ছিলেন একজন মওলানা। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি পাখীর গানের ভাষায় শুনলেন এলাহির নাম গান।

পাখী তার নিজের ভাষায় নিজের ভাব প্রকৃতির রাজ্যে প্রকাশ করছিল। পাখীটি প্রকৃতিরই একটি অংশ, প্রকৃতির রূপ, রস গন্ধ তার সুললিত তানে গীতিময় আকৃতিতে বিকশিত হচ্ছিল। এই তিন জন যাত্রীর ব্যাখ্যা তাঁদের নিজেদের মনের চিন্তাধারার প্রতিফলন মাত্র।

এই উদাহরণের অবতারণা করে প্রসংগক্রমে বলতে চাচ্ছি আমাদের সমাজ কল্যাণের কর্মসূচীর সম্পর্কে জন-গণের মনের ধারণা এবং প্রতিক্রিয়া কি? প্রতিক্রিয়ার কথা মনে হলেই দুঃখ হয়, মনে হয় একটা গ্রাম্য প্রবাদ "কি করলাম কি হইল ছাতু মাখালাম ছাই হইলো"।

কত সাধ ক'রে কত যত্ন ক'রে, কত চিন্তা ভাবনা ক'রে সমাজ কল্যাণের সব কর্মসূচী নেওয়া হলো। মনে মনে গর্বে শিহরিত হ'লাম, মনে করলাম দেশের বঞ্চিত জন-গোষ্ঠির আর দুঃখ দুর্দশার এমন ভয়াবহ রূপ থাকবে না। সমাজ কল্যাণ সত্যকারের মহতি প্রচেষ্টাই নিয়েছিল। বঞ্চিত, কর্মসংস্থান বিহীন পুরুষ, মহিলা, যুবক-দের জন্য নেওয়া হলো আয় বৃদ্ধি-জনিত কর্মসূচী, বিদ্যালয় বহির্ভূত কিশোরদের জন্য নেওয়া হলো বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কর্মসূচী। মায়েদের জন্য আয় বৃদ্ধিজনিত কর্মসূচী আর পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কর্মসূচী নেওয়া হলো। শিশুদের আর কিশোরদের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী নেওয়া হলো, আর নেওয়া হলো প্রয়োজনমত বৃদ্ধদের জন্য আয়-বৃদ্ধিজনিত কর্মসূচী।

এতিমদের জন্য কর্মসূচী নেওয়া হলো, কর্মসূচী নেওয়া হলো ভিখারীদের জন্য আর ভবঘুরেদের জন্য। সরকার করবেন দেশব্যাপী উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা, আর আমরা করব ড্রপ আউট বা পিছিয়ে পড়া জনতার উন্নয়ন পরি-কল্পনা। আমাদের উদ্দেশ্য সৎ ও মহৎ। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের বিধান দানে বিধি বাম। উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থের যোগানে সরকার হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। আমাদের এই দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশে ঘাটতি বাজেট পদ্ধতি (ডেফিসিট বাজেটিং সিস্টেমই) প্রযোজ্য। আর এই ঘাটতি বাজেটের ঘাটতি অংকের টাকা যোগান দেওয়াই যে দেশে প্রাণান্তকর ব্যাপার, সে দেশে আবার পরিকল্পনার ফল ভোগী—বঞ্চিত গোষ্ঠির জন্য আরেক পরিকল্পনার অর্থ যোগান দেওয়া বাতুলতা মাত্র। একটা বাচ্চাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অন্য একটা বাচ্চাকে হাত পা নেড়ে বলতে শুন-

ছিলাম, "মিতু! এবার ঈদে আমার দুটো জামা হয়েছে"। মিতু বলছে 'দেখাওতো'। তখন বক্তা বলছে, "আব্বা বলেছেন আমাকে একটা জামা দিবেন"। মিতু প্রশ্ন করলো, "আরেকটা"? বক্তার উত্তর "আমি আব্বার কাছে আরেকটা চেয়েছি"। আমাদের অবস্থাটাও ঐ আশাবাদী বাচ্চাটার মতই। যে অর্থ এখনও অর্জিত হয় নাই, অর্জনের সম্ভাবনা আছে, যে কোন মূহুর্তে সে সম্ভাবনা ধুলিসাৎ হতে পারে, তারই উপর প্রতিষ্ঠিত আমাদের সব উন্নয়ন পরিকল্পনা, তারই আবার অংশীদার সমাজ কল্যাণ, সম্পূরক পরিকল্পনার আর্কিটেক্ট বা স্থপতি।

যে মহা কষ্টে অর্জিত অর্থের উপর পরিকল্পনা বিরাজমান, তা'থেকে কতটুকু সমাজ কল্যাণের জন্য বরাদ্দ হতে পারে? আর সেই বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ যত সামন্যই হোক না কেন তার উপর কড়া খবরদারী ত' থাকবেই দেশের জনগণের। কারণ দেশবাসী মনে করছেন অনেক উৎকন্ঠায় অর্জিত অর্থের অর্থহীন অপচয় করছে সমাজ কল্যাণ। এই অর্থহীন ভাবছে বলেই সমাজ কল্যাণের উপর জনগণের এত ক্রোধ, সমাজ কল্যাণের সাথে জনগণের এত বিরোধ, সমাজ কল্যাণের উপর এত শ্যেণ দৃষ্টি। প্রায়ই দেখা যাবে দৈনিক বা সাপ্তাহিক খবরের কাগজে, সমাজ কল্যাণের কোন না কোন প্রোগ্রাম সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা।

যে যৎসামান্য অর্থ সমাজ কল্যাণ পাচ্ছে, তার সুষ্ঠু ব্যবহার করে সাজের বঞ্চিত, অনুন্নত পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠির উন্নয়নের আপ্রাণ প্রচেষ্টা করছে সমাজ কল্যাণ। তা জনগণ উপলব্ধি করতে পারছেন না বলেই সমাজ কল্যাণকে সুনজরে দেখতে পারছেন না। এই উপলব্ধির জন্য জনগণকে বুঝতে হবে সমাজ কল্যাণের আসল উদ্দেশ্য কি। কি তারা করতে চায়, আর তা' জানানোর দায়িত্বও আমাদেরই অর্থাৎ সমাজ কল্যাণের। আপাত দৃষ্টিতে দেখতে গেলে মনে হবে সমাজ কল্যাণের শিক্ষা বিষয়ক প্রোগ্রামের প্রয়োজন নাই, কারণ শিক্ষার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় আছে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আছে, বিশ্ববিদ্যালয় আছে। স্বাস্থ্য উন্নয়নের প্রোগ্রামেরও প্রয়োজন নাই, কারণ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আছে, মেডিকেল হসপিটাল আছে। সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্যও মিনিষ্টি অব কালচারাল এ্যাফেয়ারস্ আছে। আর শিল্পোন্নয়ন এবং নির্মাণ কার্যের তদারকিও সরকার সার্বিকভাবে জরুরী ভিত্তিতেই করে যাচ্ছেন। কাজেই সেখানে সমাজ কল্যাণের প্রোগ্রামের পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন কেন?

কিন্তু সরকার যখন বৃহত্তর কার্যক্রম নিয়ে উন্নতি ত্বরান্বিত করনের সংগে সংগে উন্নয়নের অর্থ যোগানে দিশাহারা, তখন উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলাফল ভোগের সুযোগ থেকে স্বল্প-শক্তি যে জনতা পিছিয়ে পড়লো, আগের কাতারে পৌঁছতে পারলো না, তার ব্যবস্থার দায়িত্ব নিতে হবে ভিন্নভাবে।

যে ফুল ফুটার আগে ঝরে যায়, যে নদীর ক্ষীনধারা প্রখর সূর্যের দাবদাহে শুকিয়ে যায়; তারই তদারকি সমাজ কল্যাণের দায়িত্ব। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির শিক্ষার জন্য এতিমখানায় অভ্যন্তরে কিংবা অলিতে গলিতে প্রাইমারী স্কুল আর কারিগরি প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিচ্ছে সমাজ কল্যাণ। যে জনগোষ্ঠি পয়সার অভাবে স্বাস্থ্য রক্ষার আর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে অক্ষম, তাদের জন্য অলিতে গলিতে ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা আর পুষ্টিহীনতা দূরীকরণের চেষ্টা নেওয়ার দায়িত্ব সমাজ কল্যাণের। সর্বহারা আর বাস্তুহারার সাংস্কৃতিক সংগঠনের ভারও সমাজ কল্যাণের। দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থানকারীকে উৎসাহ-উদ্দীপনা, পরামর্শ আর সহযোগিতাদানে জীবনে টিকে থাকা এবং দারিদ্র সীমার উর্দ্ধে উত্তরণের সহযোগিতা করার দায়িত্বও আজ সমাজ কল্যাণের। বিশ বছর আগের সমাজ কল্যাণের দান-খয়রাতি-কল্যাণ আজকের সমাজে অচল। সমাজ কল্যাণের ভূমিকার তাৎপর্য্য যদি উপলব্ধি করতে হয়, তা'হলে দূর থেকে আপাত দৃষ্টিতে সমাজ কল্যাণকে বিচার করলে ভুল হবে। আয়নার সামনে দণ্ডায়মান ব্যক্তির পিছনে বসে যদি আমি ভাবি আয়নাতে ঐ ব্যক্তিকে আমি সম্পূর্ণ ঠিকভাবে দেখছি তা'হলে আমি মূলে ভুল করব। আয়নার প্রতিফলনকে যদি আয়নার সামনে দণ্ডায়মান ব্যক্তির সঠিক অবস্থান বলে ধরা যায়, তা'হলে নূন্যতঃ একটু ভুল হ'য়ে যাবে। দণ্ডায়মান ব্যক্তি যদি উত্তর মুখো হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে, প্রতিফলন থাকবে দক্ষিণ মুখী হয়ে। তাই দেখে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে দক্ষিণ মুখী ধরলে সম্পূর্ণ উল্টো ধরা হবে না কি? এটা ঠিকমত বুঝতে হ'লে একটু অভ্যন্তরে প্রবেশের প্রয়োজন হয় না কি? আয়নার পিছনে যেয়ে ব্যক্তির দিকে তাকালেই শুধু বোঝা যাবে ব্যক্তিটি আয়নার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের পিছনে করে। অথচ আমাদেরকে মনে হচ্ছে আমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।

ভূমিকার যে যেমন সে দৃষ্ট বস্তুকে সেই ভাবেই দেখে। যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম, তাতে আমি জনগণকে দোষ দিতে চাইনি। তার দৃষ্টি-ভংগি সৃষ্টির জন্য আমরাই কি দায়ী নই? সমাজ কল্যাণ কি, তা ব্যাপকভাবে জনগণের মাঝে প্রচার করতে হ'লে যে পরিমাণ প্রচারের প্রয়োজন তা করার সংগতি আমাদের নেই। তাই জনগণের কাছে শুধু এই টুকুই আমরা প্রচারের চেষ্টায় ব্যস্ত যে, সমাজ কল্যাণ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য জানতে বা বুঝতে হ'লে এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হবে। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প সংগতি সম্পন্ন এই বিভাগের সাথে জনগণকেও সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে হবে। অন্য সব বিভাগের মতই সমাজ কল্যাণের দোষত্রুটি, ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে এটা অনস্বীকার্য। এই দোষত্রুটি, ভুলভ্রান্তির সাংগঠনিক সমালোচনা ক'রে জনগণ এই বিভাগকে শোধরাতে পারেন। সেটা বাঞ্ছিত। সুতরাং জনগণ যদি দেশের সর্বাঙ্গীন মংগল কামনা করেন, তা'হলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যদি তারা সমাজ কল্যাণের কর্মপদ্ধতি এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে খোঁজ খবর করেন, এবং এর সহায়তা আর সহযোগিতা করেন, তা'হলেই দেশের সর্বাংগিন মংগল সম্ভব।

ইতিহাস কাঁদে

—বিশ্বজিত সিংহ

একটা ধানের শীষ —
পাতার বেষ্টনী ভেদ করে --
যেদিন বেরিয়ে এল স্বাভাবিক প্রাণের গতিতে,
আকাশ জানালো তারে খোশ-আমদেদ,
বাতাস সে জানালো সালাম,
সূর্য্য তারে শেখালো—
নিজেরে নিঃশেষ করি কিভাবে প্রতিষ্ঠা হয় সৃষ্টির কল্যাণ।

এবং পথের পাশে দূর হতে আগা --
একটি কিশোর ছেলে ক্লান্তিতে ক্ষুধায় —
একটু জিরোতে বসে দেখেছিল তারে,
পেয়েছিল আগামী দিনের –
পরম নির্ভর।
দূরের মিনারে বসে একটি কপোত —
চেয়েছিল তার পানে, আর এক নিশ্চিত আশ্বাসে --
বুকের পালকগুলো সাদা তুলতুলে—
দুলে উঠেছিল —
ফুলে উঠেছিল।

সবই ঠিক ছিল
মৃত্তিকা মায়ের স্তন্যে — সে ধানের শীষ
তিলে তিলে বেড়ে উঠেছিল।
বুকে তার জমেছিল ফসলের শাঁস
তৃপ্তি, শান্তি, সমৃদ্ধির পরম আশ্বাস।

কিন্তু —
সর্ব্বগ্রাসী বন্যা এল — ডুবে গেল মাঠ —
ডুবে গেল পথঘাট, এবং বিরাট —
সম্ভাবনা বুকে লয়ে সে ধানের শীষ
সে ধানের শিশু --
মরে গেল চির তরে -- কয়টা বুদ্বুদে
ছড়ায়ে নিশ্বাসটুকু, অন্তিম -- করুণ।

ইতিহাস কাঁদে
সৃষ্টির সবুজ স্বপ্ন এ ধানের শীষ
যাহার কাহিনী লয়ে যুগান্ত অবধি
হতে পারতো সে ধন্য —
উজ্জ্বল — অনন্য;
পূর্ণ বিকাশের আগে ধ্বংস হল কেন?
কোন অপরাধে?

জনশক্তি উন্নয়নে সমাজ কল্যাণ

—সাহেরা আহমেদ

সমাজ কল্যাণের প্রকৃত সংজ্ঞা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান না থাকবার ফলে সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলা ঘটছে এবং অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। সমাজ কর্ম মানুষকে পরমুখাপেক্ষী না করে তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখায়—সমাজের সংগে বাঁচতে শেখায় ও উৎপাদনমুখী করে তোলে।

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামগুলি ঘন বসতি পূর্ণ। শতকরা ৮৫ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে এবং মর্মস্পর্শী দারিদ্র্যের মাঝে কোন প্রকারে দিন যাপন করে। এই বিংশ শতাব্দীতেও জীবন ধারণ পদ্ধতি সেই সাবেক কালের। সাড়ে আট কোটি মানুষের মধ্যে শিক্ষিতের হার শতকরা ২৩ জন বলেই অশিক্ষাজনিত কারণে দরিদ্র দিন দিন বর্দ্ধিত হয়ে চলেছে। শতকরা ৪৫ জনের কোনও ভুমি নেই—বছরের ছয়মাস বেকার বসে থাকতে হয়। ভাগ্যের উপর নির্ভর করে উপার্জনের আশায় গ্রাম ছেড়ে এদের কোন একটি অংশ শহরে এসে ভিড় করে সেখানের জীবনকেও বিপর্যস্ত করে তোলে। শহরের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, হাট-বাজার প্রভৃতি সমস্যাসঙ্কুল হয়ে ওঠে, দ্রুত অস্বাস্থ্যকর বস্তির বৃদ্ধি ঘটিয়ে দুর্নীতি ও অপরাধ প্রবণতার প্রসার করে থাকে। জীবন ধারণের তাগিদে ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, রাহাজানি ও অনুরূপ বিবিধ সমস্যাসমূহ জীবনকে বিপন্ন করে অর্থনৈতিক কাঠামোকে দুর্বল করে তোলে। প্রত্যক্ষ কর্মসূচী বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টায়, দান, দয়া, অনুকম্পার মাধ্যমে কতিপয় কল্যাণমূলক কাজ দ্বারা এই জাতীয় ব্যাপক সমস্যা দূরীকরণ সম্ভব নয়। সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং দক্ষ প্রয়োগ বিধির কারণেই একটি সুগঠিত সমাজের আত্মপ্রকাশ হয়। স্থিতিশীল সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থার ভিতর দিয়েই বলিষ্ঠ কর্মী জাতির উত্থান হয়। অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করবার জন্য উন্নত দেশগুলিতে সমাজ কল্যাণ পেশাকে সাদরে সর্বস্তরে গ্রহণ করা হয়েছে যেহেতু বৈজ্ঞানিক সমাজ কর্ম মানুষকে আত্মনির্ভরশীল উৎপাদনমুখী নাগরিক হতে সাহায্য করে থাকে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজ কল্যাণ আত্মরক্ষার পথ এবং সকল প্রকার উন্নয়নের মূল ভিত্তি, যেহেতু সমাজ কর্ম মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রিত ও আত্মনির্ভরশীল হতে শিক্ষা দেয়।

সমাজ কল্যাণ কর্মসূচী একাধারে সমস্যাকে প্রতিরোধ করে এবং সমস্যার সমাধান কল্পে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী প্রদান করে দুস্থ নিপীড়িত মানুষের একক, দলীয় বা সমষ্টির মাধ্যমে সাহায্য করে থাকে।

বাংলাদেশে সম্পদের তুলনায় সমস্যা বেশী হলেও এই সম্পদের যথাযথ বিন্যাস ও বিনিয়োগ ঘটলে সমস্যার সমাধান অসম্ভব নয় এবং সে জন্যই বৈজ্ঞানিক সমাজ কর্মের কলাকৌশল প্রয়োজন অধিক। জনস্ফীতি, নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্যহীনতা, বেকারত্ব, খাদ্য সংকট, গৃহ সংকট প্রভৃতি সকল সমস্যা সমাধান ঘটতে পারে জনসাধারণকে সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন করে। বাংলাদেশের মূল্যবান সম্পদ মানুষ—এই মানুষকে শক্তিরূপে ব্যবহার করে সকল সমস্যার মূল নষ্ট করা সম্ভব।

সেজন্য স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রগ্রামের (ইউ, সি, ডি) সাহায্যে সমাজ কল্যাণ বিভাগ গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ শহর ও গ্রামে (আর, এস, এস) জনগণকে সংগঠিত করে চলেছে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে যাতে তারা সরকারের মুখাপেক্ষী না থেকে স্থানীয় সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে এলাকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন এবং অধিবাসীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি কল্পে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিত্তবিনোদন ও কর্মসংস্থানের উন্নতি বিধান করতে পারে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং পরিবেশ অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে, পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে—এরূপ আটষট্টিটি শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প (প্রতিটি প্রকল্প এলাকায় গড়ে দুই লক্ষ মানুষ) ও ১৯৮০ সালে আরও তিনটি ইউ, সি, ডি, প্রজেক্ট এবং ৪টি থানায় আর, এস, এস, গ্রাম চালু করা হয়েছে। অনুরূপ গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (আর, এস, এস) চল্লিশটি থানায় (প্রতিটি থানায় গড়ে দেড় লক্ষ মানুষ) সারা দেশব্যাপী গড়ে উঠেছে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও কর্মসংস্থানের সুবিধা দ্বারা শিশু, যুবক এবং নর-নারী সকলের মনে কর্মস্পৃহা ও শিক্ষার আলোক দান করে অর্থনৈতিক উন্নতি, ভিক্ষাবৃত্তি দমন, জনস্ফীতি রোধ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধ বহুল পরিমাণে সম্ভব হয়েছে। সমাজ কল্যাণ পরিচালিত মাতৃকেন্দ্রগুলি, যুব ও শিশু কেন্দ্রগুলি এ বিষয়ে স্বাক্ষর বহন করেছে। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সমাজ কল্যাণ খাতে বরাদ্দ অর্থ শিক্ষা, কৃষি, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি কর্মসূচীর তুলনায় অতি অল্প। অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধ আন্দোলন ও কর্মসূচীকে

আরও জোরদার করা যেতো। প্রত্যেক এলাকায় সুদ-মুক্ত ঋণ সাহায্য প্রদান করে অনেক দরিদ্র পরিবারকে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ থেকে দূরে রাখা যেতো এবং এরূপে শিশু ভিখারীর সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব হতো। মাতৃকেন্দ্রগুলি অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচীর কারণে পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য দেখিয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় সমাজ কল্যাণ পরিচালিত মাতৃকেন্দ্রগুলি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ মাধ্যমে মায়েদের অর্থ উপার্জ্জনে সাহায্য করে থাকে এবং গৃহপরিচর্য্যায় পারদর্শী করে থাকে বলে এগুলি জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করছে।

মাতৃকেন্দ্রের সংগে যুক্ত শিশুকেন্দ্রগুলি চালু করবার ব্যবস্থা সকল স্থানে অর্থের অভাবে গড়ে উঠতে পারে নাই। এরূপ স্থানে শিক্ষা বিভাগের সহযোগিতা প্রয়োজন। দেশের দুই কোটি শিশুর জীবনে লেখাপড়া ও খেলাধুলার সুযোগ থাকে না—বঞ্চিত, দরিদ্র শিশুদের লেখাপড়া শেখানো, চিত্তবিনোদন এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য রয়েছে শিশুকেন্দ্র। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক রোজগারী বালকেরা অবসর সময়ে বৈকালিক কেন্দ্রে এসে যোগ দিতে পারে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও দক্ষ জনশক্তি তৈরীর প্রস্তুতি এই কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য বলে জাতীয় উন্নতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। নতুন পর্য্যায়ে শহর ও গ্রামের যুব কল্যাণ কর্মসূচী যুব কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বেকার, স্বল্প শিক্ষিত, অদক্ষ যুবকদের প্রশিক্ষণের সাহায্যে উৎপাদনমুখী করে উন্নয়নমুখী কর্মে নিয়োগ দ্বারা দেশের আইন শৃংখলার উন্নতি, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সেতু, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করে সমাজ কল্যাণ বিভাগ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিকে প্রশস্ত করেছে। দেশের পাঁচটি যুব হোস্টেল ও বিশটি যুব কল্যাণ কেন্দ্র যুবদলকে দক্ষ ও আত্মনির্ভরশীল করে শ্রম মর্য্যাদা জাগাবার জন্য টেলিভিশন রেডিও মেকানিজম, মটর মেকানিজম, হস্তশিল্প, দর্জিবিদ্যা, ফটোগ্রাফী প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করে বিদেশে যেতে সাহায্য করে বেকারত্ব দমন করে।

গ্রামের যুবকদের বিশেষভাবে সংগঠিত করে যুবসেবা গঠন ৩৮টি থানায় সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এই সকল তরুণ-তরুণীদের দল বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়ে বেকারত্ব দমন ও অর্থনৈতিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করবে। স্কুল কলেজ বর্হিভূত বেকার যুবক যুবতীদের উৎপাদনমুখী করে তোলবার জন্য তাদের দলবদ্ধ করে ফসল ফলানো ও কৃষি কার্য্যের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করছে সমবায় সুদ-মুক্ত ঋণ দানের ভিতর দিয়ে। সাথে সাথে জনসংখ্যা প্রতিরোধেও তাদেরকে অল্প বয়স হতেই উৎসাহিত করা হয়। এরূপ দল বর্তমানে গঠন করা হয়েছে যারা হাঁস, মাছের চাষ, আনারস, নারিকেল, কলারবাগান, মৌমাছির চাষ, খাদ্য সংরক্ষণ প্রভৃতি কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। একাধারে খাদ্য ঘাটতি পূরণ এবং অর্থকরী উপার্জন ঘটছে।

এর পর আর একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী 'বেকারত্ব দমন ও আত্মনিয়োগ'। তরুণ তরুণীদের ছয়শত দল হবে ক্ষুদ্র ব্যবসার পত্তনের জন্য। দশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত অনুদান গ্রহণ করে মোটর গাড়ী মেরামত, রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন মেরামত, পুকুর খনন করে মৎস্য চাষ, নৌকা তৈরী, প্রভৃতি চালনা করে বাস্তবমুখী উৎপাদনমুখী আন্দোলন গড়ে তুলবে।

সক্ষম অক্ষম প্রতিটি মানুষ জাতীয় উন্নয়নের সহায়ক হতে পারে। স্বাভাবিক সক্ষম শিশু এবং শারীরিক ও সামাজিক ক্ষতিগ্রস্ত দুইস্তরের শিশুদের কল্যাণের জন্য সমাজ কল্যাণ এর কার্য্যসূচী যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রাতিষ্ঠানিক যত্নের মাধ্যমে এতিম দুঃস্থ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা ও পুনর্বাসনের সহায়তা করা হয়। সরকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা একশত আসন বিশিষ্ট ছাব্বিশটি। শিশু সদনে এতিম বালক বালিকা স্বাবলম্বী হবার শিক্ষা নিচ্ছে। সরকারী সাহায্যপুষ্ট বেসরকারী শিশু সদনের সংখ্যা পঞ্চাশটি।

এ ছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত অনাথ শিশু ও নারীদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের জন্য রয়েছে ছাপ্পান্নটি আবাসিক প্রতিষ্ঠান। সমাজ কল্যাণ বিভাগের ঘনিষ্ট সহায়তায় ওয়াই, ডাব্লিউ, সি, এ,—আই, ইউ, সি, ডাব্লিউ—ইউ, সি, ই, সি,—এস, ও, এস, চিলড্রেন ভিলেজ প্রমুখ বিদেশী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে অনাথ শিশুদের কয়েকটি আবাসিক প্রতিষ্ঠান।

অবাঞ্ছিত ও পরিত্যক্ত শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামে রয়েছে বেবী হোম। রাজশাহীতে এরূপ হোম পরিচালনার প্রস্তুতি চলছে। দিবাকালীন শিশু যত্নকেন্দ্র সমাজ কল্যাণের একটি দৃষ্টান্তমূলক কর্মসূচী স্বল্প আয়ের কর্মজীবি মহিলাদের শিশুদের জন্য। প্রতিটি মানুষ মূল্যবান এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে। বিকলাংগ, অন্ধ, মূক, বধির শিশুদেরকে বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী নাগরিক করে গড়ে তোলবার জন্য আবাসিক স্কুল রয়েছে। সেখানে ব্যক্তিগত যত্ন ও পরিচর্য্যার সংগে তারা স্বাবলম্বী হতে সক্ষম হবে। অন্ধদের জন্য পাঁচটি ও মূক-বধিরদের জন্য সাতটি স্কুল অন্ধ সাধারণ চক্ষুষ্মান ছেলেদের সংগে একত্রে লেখাপড়া শেখবার ভিতর দিয়ে সামাজিক স্বীকৃতি সহজ করবার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী ৪৭টি উচ্চ বিদ্যালয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ

ব্রাদার্স রিসোর্চ টিচারদের পরিচালনায় অন্ধ শিশুদের ভিক্ষা দেবার পরিবর্তে লেখাপড়া করবার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। চুক্তিতে বয়স্ক অন্ধদের বিদেশে বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে পুনর্বাসন করানো হয়। এছাড়াও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোকে এরূপ কল্যাণমূলক কাজে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয়ে থাকে। শারীরিক বিকলাংগ অর্থাৎ মূক, বধির, অন্ধ, অংগহীন প্রভৃতি ব্যক্তিদের কর্মোপযোগী করে তোলবার জন্য টংগিতে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার (আই, এল, ও,) সাহায্যে একটি প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তুতি চলছে। এই সকল প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধ করে, জনশক্তি উন্নয়ন ও সামাজিক দুর্নীতির পথ রোধ করে অর্থনৈতিক উন্নতির পথকে সুগম করা। সমাজ কল্যাণ ভবঘুরে আশ্রমগুলি পেশাদার ভিক্ষুকদের ভিক্ষা থেকে সরিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় সরিয়ে নিতে চেষ্টা করে। ভিক্ষুক ধরা ছাড়াও জনগণকে ভিক্ষা দেবার বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে এই ক্ষতিকর পেশাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টায় সমাজ কল্যাণে বিশেষ কর্মসূচী রয়েছে।

কিশোর অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তার অভাবে ঘটে থাকে। সময়কালীন কর্মসূচীর সাহায্যে বিভ্রান্ত কিশোর ও তরুণদের সৎপথে পরিচালিত করবার জন্য টংগিতে একটি কিশোর অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে একুশটি 'প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিস' রয়েছে কিশোর অপরাধী ও স্বল্প-কালীন জেলখাটা কয়েদীদের সমাজ জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য।

বিদ্যালয় সমাজ কর্ম অনুরূপ একটি বিশেষ কর্মসূচী পরীক্ষা-মূলকভাবে দশটি স্কুলে চলছে—সমস্যাগ্রস্ত ছাত্রদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে অপরাধ প্রবণতা থেকে দূরে রাখবার জন্য পিতামাতা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করবার এবং এরূপ কর্মসূচীর আরও ব্যাপক প্রসার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে সমাজ কল্যাণ বিভাগের বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলি আধুনিক জীবন ধারণের সহজ জ্ঞান বিতরণ করে জনসাধারণের কর্মপ্রবণতা বৃদ্ধি করছে ঠিক তেমনই ৩৮ টি চিকিৎসা সমাজ কল্যাণ কর্মসূচী বিভিন্ন জেলা হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, যক্ষ্মা হাসপাতাল চলছে দরিদ্র রোগীদের সাহায্যার্থে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, ঘন ঘন আদম প্রতিরোধ, ছোঁয়াছে অসুখ থেকে রক্ষা করা এবং পুনর্বাসনে সহায়তা যারা একাধারে স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অপরিহার্য্য বললে অত্যুক্তি হবে না।

জনশক্তি সংরক্ষণ এর জন্য সমাজ কল্যাণ কর্মসূচীর অবদানকে অধিকতর সাফল্য মণ্ডিত করবার জন্য চাই উপযুক্ত প্রশাসনিক সমর্থ এবং অন্যান্য জাতি গঠনমূলক সংস্থার ন্যায় স্বীকৃতি ও মর্যাদা দান।

পিকু বড় একা

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

—কাজী শামসুন

আমরা উপন্যাস, গল্প পড়তে ভালবাসি। জীবনটাই যে একটা বিরাট উপন্যাস ও নানা ছোট গল্পের সমাহার তা পিকু অনেক পরে বিরাট ভাবে উপলব্ধি করেছিল। সেদিন হঠাৎ তার সাথে নগরবাড়ী ফেরীতে দেখা হয়ে গেলে তার কাছ হতে এমনি একটা মন্তব্য শুনেছিলাম। পিকু আমার ঘনিষ্ট বান্ধবী। এক সাথে স্কুল ও কলেজে পড়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সাথেই ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু অর্থনীতিতে অনার্সের তৃতীয় বর্ষে এসে পিকু হোঁচট খেল। হঠাৎ একদিন একটি ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে ক্লাশের সামনে এসে গাড়ীতে বসেই আমাকে আর অর্চনাকে ডেকে পাঠাল। আমরা কমনরুম হতে বেরিয়ে এসে বদ্ধ গাড়ীর সামনে দাঁড়ালাম। আমি যখনকার কথা বলছি তখন ঢাকায় ঘোড়ার গাড়ী চলে। গাড়ীর দু-পাট খুলে দিয়ে পিকু আমাদের দেখে উচ্ছসিত হয়ে হেসে উঠল। অপরূপ সাজে পিকুকে দেখলাম বধুবেশে। গহনায় যেন মুড়ে আছে। হেসে বল্ল—মা দিয়েছেন তার সব গহনা। পরে এলাম তোদের কাছে। আয় গাড়ীতে ওঠ। আমার সাথে আজ দুপুরে খাবি। আমি বল্লাম ক্লাশ আছে যে। পিকু হেসে বল্ল—একদিন না হয় আমার জন্য ক্লাশ নাই করলি। আয়, বই পত্রগুলি নিয়ে আয়, অপেক্ষা করছি। আমরা সেদিন বিস্মিত হয়েছিলাম। এমনি হঠাৎ করে পিকুর বিয়ে হয়ে যাবে বলে আমরা মনে করিনি। আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম তখন মুসলমান ছাত্রী খুব কমই ছিল। পিকু কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রথম বিভাগে বৃত্তি নিয়ে আই, এ, পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে অনার্স ক্লাশে ভর্তি হয়েছিল। মেধাবী ছাত্রী। পিকুর আসল নাম সুলতানা। দেখতেও বেশ সুন্দরী। ফর্সা রং, ছিমছাম গড়ন, দেখলেই কেমন যেন আপনজন বলে মনে হয়। মুখে সবসময়ই একটি সপ্রতীভ হাসি লেগেই থাকত। অর্থনীতির বিভাগ প্রধান তাকে বেশ স্নেহের চোখে দেখতেন। আমি অনেক সময় রসিকতা করে বলতাম—ক্লাশের বেশ মেধাবী ছাত্র বেইস খান তোর পেছনে লেগেছে বলে আশংকা করছি। নাক সিটকিয়ে বলত, লাগতে দে। ক্লাশের ছেলেদের আমি পাত্তা দেই না। আমি জানতে চাইলাম, ও কাদের পাত্তা দেবে বলে ভেবেছে, হেসে বলেছিল, জ্ঞানী গুণী ও একটা সবল পুরুষ। এসব ছিচ কাঁদুনে ছেলে ছোকড়া নয়। বই পত্র নিয়ে ওর পাশে বসতে বসতে অনেক কথাই জেনে নিলাম। ভাবলাম এবার পিকুর পছন্দ সই পাত্রটির দেখা পাব। ওর বাসায় গিয়ে গাড়ী থামলো। আমরা নেমে গিয়ে সরাসরি ওর ঘরে ঢুকলাম। ও বল্ল ঘরে আর কেউ নেই। আমি প্রশ্ন করলাম তোমার পছন্দ করা ব্যক্তিটি কোথায়? হেসে বল্ল—হবে, হবে তোঁদের সাথে সাক্ষাৎ হবে। ও-ওর ভাবীকে আনতে গেছে। এসে পড়ল বলে। আমরা একসাথে খাবো। একটি ছেলে এসে আমাদের সরবৎ পরিবেশন করে গেল। পিকুর মা একবার এসে আমাদের দেখে বল্লেন—দেখছ পিকুর কাণ্ড। ভারি ভারি গহনাগুলি পরে কেমন অনায়াসে ঘুরে বেড়াচেছ। আমার বয়স যখন মাত্র চৌদ্দ বৎসর তখন আমার বিয়ে হয়। আর সেদিন আমি এগুলো পরে কেঁদে ফেলেছিলাম। সাথে একটা চন্দ্র হারও ছিল। পিকু সেটা আর পরতে সাহস পায়নি। গলার হারটি চব্বিশ ভরি সোনার। তিন দিন ধরে ও হার পরে থাকতে হয়েছিল। রাতে ঘুমাতে যাবার সময় খুলতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার খালুজান চোখ রাংগিয়ে বল্লেন—খবরদার খুলবে না। এ হার না হলে নাকি তোমাকে বিয়ে দেবে না বলে পণ করেছিলেন তোমার আব্বা। এবার সখ মিটিয়ে নাও। তিন দিনের দিন তার মায়া হয়েছিল। খুলে দিয়েছিলেন নিজেই। খোলার পর দেখি ঘাড়ে ঘাঁ হয়ে গেছে। ব্যথায় বেশ কয়েক দিন ভুগেছি। সেই যে খুলেছি আর আজ এই প্রথম পিকু ওগুলি পরল। বিয়ের দিন অবশ্য পিকু ওর শাশুড়ীর দেওয়া গহনাই পরেছিল। ওর পরার ময়ূরপংখী বেনারসীটিও আমার বউ ভাতের দিনের পরা শাড়ী। পিকু মায়ের কথা শুনে হেসে ফেলেছিল। পরে মাকে জড়িয়ে ধরে বল্ল—কেন বল না, আমাকে এ শাড়ীতে কেমন লাগছে?

মা আদর করে বল্ল—ভাল লাগছে। আমার সামনে ভেসে উঠছে পঁচিশ বৎসর পূর্বের একটি দৃশ্য। আমার গহনাগুলো পরে কিই না দুরবস্থা আর তা নিয়ে তোর আব্বার কিই না কৌতুক। এমন সময় বেশ লম্বা একজন সুদর্শন যুবক একজন অসামান্য সুন্দরী মহিলাকে হাত ধরে এসে ঢুকলেন। দেখে মনে হলো আজকের উৎসবের নায়ক। পিকুকে বল্লেন—ভাবীকে নিয়ে এলাম। পিকু মাথায় ঘুমটা টেনে পা ধরে কদমবুচি করল। পিকুর মাকে দেখিয়ে

তিনি বল্লেন—উনি অঙ্গনা। ভাবী আদরের সাথে কদমবুচি করলেন। পিকুর মা মহিলার চিবুক ছুঁয়ে চুমু খেলেন। এবং তাকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন। পিকু আমাদের দিকে চেয়ে বল্ল—এরা আমার বান্ধবী নায়লা আর অর্চনা। ভদ্রলোক আমাদের প্রতি অভিবাদন জানিয়ে বল্লেন—আপনাদের আগমনে আমি আনন্দিত। পরে পিকুর দিকে চেয়ে বলেছিলেন, আজ গহনার দোকান খুলেছ বলে মনে হচ্ছে। তারপর অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা হলো। ভদ্রলোক খুব আলাপী নয়। বেশ একটু চাপা প্রকৃতি, খুব একটা দিল খোলা মনে হলো না।

সেদিন বেশ রাতে বাড়ী ফিরেছিলাম। পিকু ও তার স্বামী আমাদের বাসায় পৌঁছে দিয়েছিল। অর্চনা ক্লাশে একদিন মন্তব্য করেছিল যে পিকু জীবনে খুব একটা সুখী হতে পারবে না। যতই গুণী আর সবল পুরুষ হউক না কেন তার স্বামী, পিকুর মত উদার নয়। পিকু অনেক দিন ক্লাশে আসে নি। বেশ কিছু দিন পর ক্লাশে এলো। মনে হলো বেশ রোগা হয়ে গেছে। কথা কমই বল্ল। ওর কাছ হতে জানতে পারলাম যে অনার্স বাদ দিয়ে পাশ কোর্স নিয়ে বি, এ, পরীক্ষা দেবে। বলেছিল তাড়াতাড়ি বি, এ, পাশ করা দরকার। আমরা একটু অবাক হয়ে ছিলাম। আমাদের কাছ হতে পিকু বেশ কিছুদিন ধরে হারিয়ে গেল। এত ভাল ছাত্রী অথচ তাড়াহুড়া করে বি, এ, পরীক্ষা দিয়ে সে ডিসটিংশন পেল না। প্রায় সাত বৎসর পর পিকুকে দেখলাম। আমি তখন এম, এ, পাশ করার পর নিজেকে শুধু ব্যস্ত রাখার জন্য আমাদের বাড়ীর কাছেই একটি মেয়েদের স্কুলে সহকারী শিক্ষিকার কাজ নিয়েছিলাম। আমাদের প্রধান শিক্ষয়িত্রী তার স্বামীর কর্মস্থলে চলে যাওয়ার শূন্য পদে একজন নূতন প্রধান শিক্ষয়িত্রী এলেন। শুনলাম তিনি বি, টিতে ফার্ষ্ট ক্লাশ পেয়েছেন। অবশ্য স্কুলের কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ট্রেনিং প্রাপ্ত ছাড়া প্রধান শিক্ষয়িত্রী নেবেন না। প্রধান শিক্ষয়িত্রীর অফিস কক্ষে স্কুল কমিটির সভাপতি আমাদের সকলকে ডেকে পাঠালেন। আমি ঘরে ঢুকেই বিস্মিত হলাম। পিকু বসে আছে সভাপতির পাশে। আমরা ঢুকতেই পিকুর দিকে দেখিয়ে দিয়ে তিনি বল্লেন—আমরা একজন সুযোগ্য প্রধান শিক্ষয়িত্রী পেলাম। পিকু আমার দিকে চেয়ে একটু হাসল। পিকু শারীরিক দিক দিয়ে তেমনই আছে। তবে মুখে একটা বিষাদ ভাব বিরাজমান। বেশ রাশভারী ব্যবহার। প্রথম কয়েক দিন তাকে কাছে পেতে অসুবিধা হলো। প্রায় দশ পনেরো দিন পর ছুটির পর ফিরবার জন্য অপেক্ষা করছি। স্কুলের বাস কাছে এসে দাঁড়াল। ভেতর থেকে পিকুর গলা শুনা গেল—তুমি নামছে। গাড়ীতে উঠে পড়। গাড়ীতে উঠে সামনের সিটে পিকুর পাশে বসলাম। পিকু আমার হাতটি ধরে বল্ল—সুযোগ পাইনি তোর সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে একটু কথা বলার। ঐ সামনের বড় রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে প্রথম গলিটার প্রথম বাড়ীতেই আমি থাকি। বাসের ড্রাইভার মেয়েদের পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে তোকে নিয়ে যাবে। চল আমার সাথে চা খাবি। আমি বল্লাম—থাক। আমার বাড়ীতে মা যে ভাববেন? পিকু হতাশ স্বরে বল্ল—তবে থাক, আরেক দিন আসিস। পিকুর কথার সুরে আমার মনটা ব্যথায় ভরে গেল। আমি বল্লাম—না, চল তোর ওখানেই যাওয়া যাক। পিকুর মুখখানি খুশীতে ভরে উঠল। আমরা ঘরে ঢোকার সাথে সাথে একটি পাঁচ বৎসরের ছোট ছেলে এসে দাঁড়াল। পিকুর কাছে এসে হাত ধরল। পিকু হেসে বল্ল—আমার ছেলে মহি। আমার জীবনের আশার আলো। ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে নামিয়ে দিয়ে বল্ল—তুমি খেলা কর গিয়ে। আয়াকে ডেকে দু'জনার জন্য চা-নাস্তা দিতে বল্ল। ছোট একটি ড্রইং রুম। সামান্য আসবাব। কিন্তু সুরুচির পরিচায়ক। আমি মহি চলে যেতেই প্রশ্ন করলাম—কর্তাটি কোথায়? পিকু হেসে জবাব দিল—হারিয়ে গেছে।

আমি অর্থ না বুঝে চেয়ে রইলাম। পিকু মলিন হেসে বল্ল—সবই বলব বলেই তো তোকে নিয়ে এলাম। জীবনটা যখন হারিয়ে যায় তখন কাহিনী হয়। তোকে সে হারিয়ে যাওয়া কাহিনী শোনাব। কিন্তু আজ তোর সময় কম। এর মধ্যে আয়া চা নিয়ে এলো। আমি বিস্কুট তুলে নিলাম। পিকু বল্ল—তোকে পেয়ে আমার সমস্ত না-বলা কথাগুলি উজাড় করে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে দমকা বাতাসের মত আমার মনের জমা কথাগুলি তোকে দফা করে ছুড়ে দিই। আর সাথে সাথে প্রশান্ত মনে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ি। আজ দু'মাস ধরে ঘুমাই নি। আমি বল্লাম—আমার যে আজ বাড়ী যেতেই ইচ্ছে হচ্ছে না। চা খেয়ে নে। আমি ড্রাইভারকে দিয়ে তোর বাড়ীতে খবর পাঠিয়ে দেব। আমি চা খেয়ে ওর শোবার ঘরে গিয়ে খাটের উপরে একটা বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়লাম। পিকু বাথ রুম হতে হাত-মুখ ধুয়ে এসে আয়াকে মহিকে তার কাছে দিতে বল্ল। দেখলাম পিকু আর মহি বিছানায় বসে কথা বলছে। মহি তার শিশু সুলভ প্রশ্ন করছে। পিকু তার জবাব দিচ্ছে। পিকু আমার দিকে চেয়ে বল্ল—একটু জিরিয়ে নে—সারারাত ভরে গল্প করা যাবে। বাইরে তখন মুষল ধারে বৃষ্টি নেমেছে।

পিকু উঠে গিয়ে রেডিওটা খুলে দিল। বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল গানটি বাজতে শোনা গেল। পিকু হেসে বল্ল—জানিস আমিও আমার কদম ফুলের মালা করেছি বৃথাই দান। আমি বিস্মিত হলাম। বুঝতে পারলাম মনে তার একটা বিরাট ক্ষত। রাতের খাওয়া শেষ হলে পিকু আমাকে নিয়ে ড্রইংরুমে চলে এলো। সোফায় বালিশ দিয়ে বল্ল—আরাম করে বোস। চাস্ তো বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়তে পারিস। কিন্তু খবর-দার ঘুমাতে পারবি না। আমি হেসে বল্লাম—পাগল। একটা ট্রেজিডির আভাস পাচ্ছি। না শুনেই কি ঘুমাব মনে করিস। অন্য সোফাটিতে আধ শোয়া অবস্থায় পিকু বলতে লাগল—তোদের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই বি, এ, পরীক্ষা দেয়ার পর থেকে। তোরা এম, এ, পাশ করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম কিন্তু পাশ করা হল না। স্বামীকে নিয়ে বেঁচে থাকার তাগিদেই আমাকে এম, এ, পড়া ছেড়ে বি, টি, পড়তে হলো। হ্যাঁ কর্তাটির কথা জিজ্ঞেস করছিলি। তিনি বর্তমানে বিলেতে আছেন। বিয়ের পর কিছুদিন সুখেই চলেছিল। ছ'মাস না যেতেই অনুভব করলাম ওর পরিবর্তন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীটা ছেড়ে দিল। টাকার নেশায় পেয়ে বসল। ব্যবসা আরম্ভ করল। ধনী একজন ব্যবসায়ীকে পার্টনার হিসাবে নিয়ে স্পীড বোট তৈরীর কাজে হাত দিল। রাত করে বাড়ী ফিরত। জিজ্ঞেস করলেই বলত—ব্যবসায়ের কাজ—সময় ঠিক রাখা সম্ভব হয় না। আমার জন্য অপেক্ষা না করে তুমি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। আমি অবশ্য প্রথম প্রথম জেগেই থাকতাম। এক দিন বেশ রাত করে ফিরল। আমি দরজা খুলে দিতেই একটা বিশ্রী গন্ধ পেলাম। আমি অবশ্য এগুলোর সাথে পূর্বেই পরিচিত ছিলাম। আমার বড় বোনের স্বামী মাঝে মাঝে দামী হুইস্কি খেতেন। সরকারের বড় চাকুরে। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার। আমার বোন এ অভ্যাসটা কোন দিনই বরদাস্ত করেনি বলে আমিও মদ পান ভাল চোখে দেখতাম না। আমি এই প্রথম হোঁচট খেলাম। আমি সে দিন রাগ করে তাকে অনেক কটু কথা শুনিয়েছিলাম। এর পর কয়েকদিন সে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরত। কিন্তু মদের গন্ধ পেতাম. আমি সে সময় আমার আব্বার বাড়ীতে থাকতাম। আমার স্বামী সাহেদের কাজের সুবিধা হবে বলে আব্বা আমাদের জন্য একটি ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমি যে ঘরটিতে থাকতাম সেটা অন্য সকল ঘর হতে বিচ্ছিন্ন। কাজেই সাহেদের এ অধঃপতন তারা জানতে পারেনি। আর আমিও লজ্জায় এ সব তাদের বলতে পারিনি। কারণ অনেক পাত্রের মধ্যে সাহেদের সাথে বিয়েতে আমার মতটাই প্রাধান্য পেয়েছিল। আব্বা অবশ্য বলেছিলেন—ভাল করলি না মা। ছেলে বড়ই খাম খেয়ালী। তোর স্বামী হিসাবে সাহেদ খুব ভাল হবে না বলেই আমার মনে হচ্ছে। আমি তখন মনের দিকে অনেক খানি এগিয়ে গিয়েছি। কাজেই সাহেদের সাথে বিয়েটা শেষ পর্যন্ত হলো। ও হ্যাঁ-আমি যে দিকের ঘরটিতে থাকতাম তারি সামনের দেওয়ালে একটি দরজা ছিল। সে দরজা দিয়ে পাশের বাড়ী যাওয়া যায়। পাশের বাড়ীতে থাকতেন আমার একজন দূর সম্পর্কের খালা। তার মেয়ে বীথি আমাদের বাসায় সব সময়ই আসা যাওয়া করত। আমি তাকে ছোট বোনের মতই ভাল বাসতাম। সাহেদের সাথে তার বেশ হাসি ঠাট্টা চলত। আমার ভালই লাগত।

আমি তখন এম, এ, ক্লাশে ভর্তি হয়েছি। কাজেই দুপুরে প্রায়ই ক্লাশে থাকতাম। মাঝে যদিও বা কখন কখন বাড়ী ফিরতাম তখন দেখতাম সাহেদ বাড়ীতে ফিরে এসেছে। আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম তুমি দুপুরে বাড়ী ফিরেছ, তোমার দুপুরে বোধ হয় কোন কাজ নেই। প্রশ্নের জবাবে সাহেদ জানিয়েছিল যে তার রাতের কাজ এত বেড়ে গিয়েছে যে দুপুরে বিশ্রাম করতে বাড়ী ফিরে আসে। সাহেদ গভীর রাতে মদ খেয়ে বেহুস হয়ে ফিরতে লাগল। আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম। সমস্ত দিলে একটা বিরাট হতাশা। তখন আমি অন্তঃস্বত্বা। খুবই ক্লান্ত, শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। ক্লাশে প্রায়ই কেমন অস্থির লাগে। একদিন হঠাৎ খুবই অসুস্থ লাগায় বাড়ীতে চলে আসি। আমাদের বাড়ীটা বেশ বড়। গেট পেরিয়ে বেশ কতকটা পথ পেরিয়ে আমার ঘরে আসতে হয়। আমার আব্বা আম্মা, কাজের লোকেরা দিবা নিদ্রায় অভ্যস্ত। এ সময় দুপুরের খাওয়া শেষে সকলেই একটু ঘুমিয়ে নেয়। আমি নিজের ঘরে না ঢুকে পাশের বাথরুমে ঢুকে মুখ হাত ধুয়ে নিলাম। মুখটা মুছছি এমন সময় এক ঝলক হাসি আমাকে সচেতন করে দিল। বীথিকে বলতে শোনা গেল—যাও আপা এসে পড়লে কি মনে করবেন। আজকাল আপা অসময়ে বাড়ী ফেরেন। সাহেদ বলেছিল—আরে না না কতটুকুই বা সময় লাগবে। এসো কাছে এসো। এ সময় ও আসবে না। আমি স্তম্ভিত। আমি কি করব বুঝতে পারলাম না। ঘৃণায় আর সে ঘরে ঢুকলাম না। একটা অসহ্য বিতৃষ্ণায় মন শক্ত হয়ে আসতে লাগল। আমি সোফা

সাহেব ঘরে চলে গেলাম। ঘরের পেছনে কয়েকটি ফুলের টবে আমি কিছু বেলী ফুল লাগিয়েছিলাম। কয়েকটি ফুল ছিড়ে আমি ছড়িয়ে দিলাম। মিনিট পনের পর আমি আবার ঘরে ঢুকলাম। ঢুকতেই দেখলাম পরনের কাপড় গুছাতে গুছাতে বীথি বেরিয়ে যাচ্ছে। সাহেদ বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছে। শোয়া অবস্থায় বলছে সে ক্লান্ত। বইগুলো টেবিলে রাখার শব্দ শুনে সাহেদ একবার চাইল—আবার সে তেমনি শুয়ে রইল। সারাটা বিকেল আমি নীরব হয়ে রইলাম। রাত দশটায় সময় সাহেদের খাবার টেবিলে রেখে আয়া আমাকে খেতে ডাকল। আম্মা আমার জন্য বসে ছিলেন। আমার মুখের দিকে চেয়ে আম্মা বল্লেন—তোর শরীরটা ভাল নেই বোধ হয়। কেমন শুক্‌নো শুক্‌নো লাগছে। আমি নীরব হয়ে রইলাম। পরে আবার আম্মা বল্লেন—ডাঃ লুসীকে খবর দিয়েছি। আগামী কাল বিকেলে আসবেন। বাড়ীর বাইরে যাসনে। আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। আম্মা কিন্তু আমার দিকে কেমন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। আমি কোন রকমে কিছু মুখে দিয়ে ফিরে এলাম ঘরে। সাহেদ প্রতি দিনের মত সেদিন সন্ধ্যায় বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি পাশের খাটে নিজের বিছানা করে নিলাম। কিছুতেই ঐ বড় খাটটিতে শুতে পারলাম না। এ ঘরেও আমার থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু আব্বা-আম্মার মনের দিকে চেয়ে অন্যকোথাও রাত্রে থাকার ব্যবস্থা করতে পারলাম না। কত রাতে সাহেদ ফিরে-ছিল আমি বলতে পারব না। আমার ঘুমটা বেড়ে গিয়েছিল। বোধ হয় শারীরিক পরিবর্তনের জন্য। ভোরে উঠে আমার নিয়মিত কাজ করলাম। সাহেদের চলে যাওয়ার পর ওর একটা ফাইল আমি অন্যমনস্ক-ভাবে খুললাম। দেখলাম ব্যবসা সংক্রান্ত নানা চিঠি। হঠাৎ একখানে একটি বাংলায় লেখা চিঠি ভাঁজ করা দেখতে পেলাম। চিঠিটা পড়লাম—উপরে কোন সম্বো-ধন নেই। তবে পড়ে মনে হলো কোন কারণে যদি সে কাউকে দুঃখ দিয়ে থাকে তবে সে যেন তা মাফ করে দেয় এবং আগামী কাল থেকে সে নূতন জীবন শুরু করবার বাসনা রাখে। আমি ভেবেছিলাম এ চিঠি আমাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা। আমি আমার মন হতে সব রকম সন্দেহ মুছে ফেললাম। নূতন করে আবার নিজেকে ভাবতে লাগলাম। ঘরটি সুন্দর করে গোছালাম। বড় খাটটিতে আবার আমাদের দুজনার শয্যা নূতন করে পাতলাম। দুপুরে আর সেদিন ক্লাশে গেলাম না। সাহেদ ফিরে এলো দুপুরে। এসে প্রশস্ত খাটের ধব ধবে বিছানায় দুজনার বালিশ দেখে কেমন অপ্রসন্ন মুখে আমার দিকে তাকাল। আমি বুঝতে পারলাম না যে জন চিঠি লেখে মাফ চাইতে পারে সে এখন অপ্রসন্ন মনে একটি মিলন শয্যার প্রতি তাকায় কি করে। আমি টেবিলে ওর জন্য খাবার সাজিয়ে দিচ্ছিলাম। সাহেদ কোন কথা না বলেই মুখ হাত ধুয়ে খেতে বসল। একবার জিজ্ঞেস করল না আমি খেয়েছি কি না। আমি ভাবলাম গত রাতে ভিন্ন শয্যায় শোয়া ওর ভাল লাগেনি বলেই সে—এমন নীরব থাকছে। আমি ওর খাওয়া হলে আম্মার ডাক শুনে পাশের ঘরে গেলাম। প্রায় বিশ মিনিট পর ঘরে ঢুকে দেখলাম বীথি টেবিলের ফাইলটি ঘাটছে। সাহেদ বিছানায় শুয়ে শুয়ে সিগারেট খাচ্ছে। আমি ঢুকতেই বীথি একটু অপ্রতীভ হাসি হেসে বল্লে—তোমার আজ ছুটি নাকি? আমি সংক্ষেপে বললাম না। বীথি ফাইলটি থেকে সেই চিঠি খানা তুলে নিল। আমি দেখতে পেলাম সেটি সে অন্য হাতের মুঠোয় রেখে ফাইলটি রেখে দিল। বীথি বলল—চলি সাহেদ ভাই। এখন আপা আছে। তোমার সময় কাটবে ভাল। এ কথা বলে এতক্ষণ পিকু কেমন যেন হাঁফিয়ে উঠেছিল। আমি বাধা দিয়ে বললাম তোর গলা শুকিয়ে গেছে, একটু চা খেয়ে নিলে ভাল লাগবে তোর। পিকু উঠে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর দু'কাপ ধূমায়িত চা নিয়ে এলো। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে পিকু আবার তার কথায় ফিরে গেল। আমি বুঝতে পারলাম চিঠিটা যার উদ্দেশ্যে লেখা সে ব্যক্তিটি আমি নই। বীথিকে লেখা চিঠিটি আমার কাছে অনেক না-বলা কথার দ্বার খুলে দিল। বিকেলে ডাঃ লুসি আমাকে দেখতে এলেন এবং এ সময় শারীরিক যত্নের বিষয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়ে খাদ্যের এক বিরাট তালিকা লিখে দিয়ে বিদায় নিলেন। আমি নীরবে সবই শুনে গেলাম। কিন্তু আমার তখন একটি কথাই মনে জাগছিল। সেটা হচ্ছে, যে প্রেমের ভিত্তি করে এক অতিথির আগমনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে সে প্রেমের ভিত্তি টলে উঠেছে। আমার সমস্ত মন জুড়ে একটা বিরাট হাহাকার। আমি পিকুর জীবন কাহিনী শুনছিলাম আর মনে হচ্ছিল কত আঘাত হয়েই আজ পিকু তার জীবনের অতীত দিনের ঘটনাগুলি আমার কাছে বলছে। পিকু বলে যাচ্ছিল—আমি সে সময়টায় কোথাও যেতাম না। আমি রাতে ভিন্ন বিছানায় শুয়েই রাত কাটাতাম। একদিন গভীর রাতে একটা শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। শুনতে পেলাম মা চিৎকার করছেন চোর চোর বলে। আমি শয্যা থেকে নেমে পাশের বিছানাটা খালি দেখতে পেলাম। মশারীটানা রয়েছে। জোছনার আলোতে দেখতে পেলাম ঘরে কেউ নেই। ধীরে ধীরে দরজার কাছে গিয়ে দেখলাম দরজাতে ছিটকিনি লাগানো নেই। আমি দরজা টানলাম কিন্তু

খুলল না। দেখলাম দুকপাটের মাঝখানে ভাঁজ করে একখানা সাদা কাগজ রাখা হয়েছে যাতে বাতাসে দরজা খুলে না যায়। আমি আবার ধীরে ধীরে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর দেখতে পেলাম—নিঃশব্দে সাহেদ ঘরে ঢুকছে। ঘরের চারিদিক দেখে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। আমি সে রাতে চুপ করেই রইলাম। এরপর আরও নানা ঘটনার মধ্যে আমার কেবলই মনে হতে লাগল একটা বিরাট অশুভ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। খালা আমাকে একদিন ডেকে পাঠালেন। খালার ওখানে গিয়ে যা শুনলাম তাতে আর সন্দেহের কোন অবকাশই রইল না। খালা নানা কথার মধ্যে বল্লেন—বীথির প্রায় তিন মাস ধরে মাসিক বন্ধ। তিনি মনে করছেন ভিটামিনের অভাবে এমন হচ্ছে। আমাকে অনুরোধ করলেন ডাঃ লুসির সাথে পরামর্শ করতে। মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। বাড়ীতে ফিরে এসে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম আম্মা শব্দ শুনে দৌড়ে এলেন। ভাবলেন এ অবস্থায় মাথা ঘুরা সম্ভব। তিনি বিকেলে ডাঃ লুসিকে আবার ডাকালেন। ডাঃ লুসি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। বেশ হাসি খুশী। এসে একগাল হেসে বল্লেন—পিকু আবার কি অঘটন ঘটিয়েছে। তোমাকে আমি বেশী চলা ফেরা করতে বারণ করেছি। শুনলাম পড়ে গিয়েছিলে। এসো বিছানায় শুয়ে পড়। কিছুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে দেখে বল্লেন—না, সব ঠিকই আছে। চলা ফেরা করার সময় দেখে শুনে চলো। আমি একটু ইতস্ততঃ করে বল্লাম—কুমারী মেয়ের মাসিক বন্ধ হলে কি করতে হবে। আমার প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে বল্লেন কেন? আমি বল্লাম—আমার বোনের এমন হয়েছে। একবার দেখবেন। ডাঃ লুসি বল্লেন—তোমার বোন বীথির বিষয়ে বলছ ত? আমি গতকাল দেখে দিয়েছি। আজ তার পিরিয়ড হয়ে যাবার কথা। ঠিক আছে যাবার সময় দেখে যাব। আমি বল্লাম—বীথি নিজেই আপনার কাছে গিয়েছিল কাল? ডাঃ লুসি বল্ল হ্যাঁ। পরে তিনি ব্যাগ বন্ধ করে আমাকে সর্বক্ষণ হাসি খুশি থাকতে বলে গেলেন। এক ঘন্টা পর আমি বীথির বাসায় গেলাম। আমাকে দেখে খালা খুশী হয়ে কাছে এসে বল্লেন—বীথি শুয়ে আছে। সাহেদ পাশে বসে গল্প করছে। পরিস্কার হয়ে গেছে তবে একটু যেন বেশী হচ্ছে। লুসি এসে বল্ল তুমি পাঠিয়েছ। আমি একবার ভাবলাম চলে যাই। খালাম্মা কি ভাববেন মনে করে বীথির ঘরে গেলাম। বীথি শুয়ে শুয়ে হাসছে। সাহেদ তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আমাকে দেখে সাহেদ বল্ল—বীথির শরীর ভাল না। কারখানায় যাবার পথে দেখতে এলাম। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল —কি অসুখ ওরা দু'জনে কিছুক্ষণ নীরব রইল। পরে বীথি বল্ল—তেমন কিছু নয়। আপা তুমি বস। আমি বল্লাম—না আমি যাই। আর দাঁড়ালাম না। বাড়ী ফিরে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলাম। ক্রমেই আমি কেমন আকাশে দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলাম। আমার আব্বা এ বিষয়ে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি আমার জন্য নানা রকম ফল রোজই নিয়ে আসতেন। আব্বা খেতে বসলেই আমার ডাক পড়ত। ঠিক হলো আব্বার খাবার সময়ে আমাকে পাশে বসে খেতে হবে। তাতে আমার শরীরটা কিছু ভাল হলো। কিন্তু মন আমার তখন একেবারেই ভেংগে গিয়েছে। সাহেদের সান্নিধ্য আমাকে অহরহ পীড়া দিতে লাগল। একদিন আম্মা আমাকে ডেকে বল্লেন—তোর সাথে একটা গোপন কথা আছে। আমি কাছে এসে বসলাম। আম্মা আঁচল হতে চাবি খুলে বড় ট্যাংক হতে গহনার বাক্সটি খুললেন। আম্মার গহনার বাক্সটি সত্যিই অপূর্ব। একটি সেগুন কাঠের—খয়েরী রংগের ছোট বাক্স। তাকনা খুলতেই যেটা চোখে পড়ে সেটা একটি পুষ্প হার যে হারটি আমি সেদিন পরেছিলাম। তুলার উপর বিছান রয়েছে। পাশের দুটো ছোট খুপড়িতে গলার চিক। আমি চেয়ে রইলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল নীচের সারির চেনটি—কে যেন নিপুন হাতে কেটে নিয়েছে। আমি বিস্ময় হতবাক হয়ে গেলাম। আমার দিকে চেয়ে আম্মা বল্লেন—বাড়ীর লোক ছাড়া এ কাজ কেউ করেনি। কিন্তু সে কে? আম্মার প্রতি চেয়ে বল্লাম তুমি ত আমাকেই এ গহনাগুলি দিতে চেয়েছিলে। আমি নেইনি—শুধুমাত্র সেদিন পরেছিলাম। ফেরৎ দেবার পর তুমিই সাজিয়ে রেখেছিলে। আম্মা হঠাৎ চকিত হয়ে বল্লেন—আরে নারে তুই নিবি কেন? তোকে এ কথা জানিয়ে রাখলাম। তুই ভেবে দেখ কে এ কাজ করতে পারে। আমি বল্লাম—আমাদের বাড়ীতে তা হলে এখন চোরের উপদ্রবও হয়েছে। আচ্ছা চিন্তা করে দেখি। ঘরে ফিরে একদিনের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। সাহেদের চরিত্রের নানা রকম দোষগুলো তখনও আমার চোখে পড়েনি। এক রাতে সে বল্ল—আমার দুহাজার টাকার বড়ই দরকার থাকলে দাও। আমি মাসের শেষে বিল পেলেই দিয়ে দেবো। আমি উঠে গিয়ে আমার শাশুড়ীর দেওয়া পাঁচ ভরির সোনার হার ও দুটো চুড়ি দিয়ে বল্লাম—এতে হবে? সাহেদ গহনা দেখে চমকে উঠেছিল। পরে বলেছিল—না না গহনা নেব না। আর এ গহনা গুলিতে দু'হাজার টাকা হবে না। আমি একটি পুটুলিতে গহনাগুলি দিয়ে হেসে বলেছিলাম। বাকী টাকা গুলো যোগাড় করে নিও। পরে আমাকে ওগুলো তৈরী করে দিলেই চলবে। সাহেদ চিন্তিত মুখে পুটুলিটা পকেটে পুরে রাখল। তারিখটা আমার মনে ছিল। সাহেদের টাকার প্রয়োজন, আমার গহনা দেওয়া, আমার গহনা চুরি যাওয়া,

ইত্যাদি ঘটনাগুলো আমার মনে ঘুর পাক খেতে লাগল। হঠাৎ একটা কথা মনে হলো যে চরিত্রহীন সে চুরিও করতে পারে। কারণ আমাদের ছোট বোনরা এ কাজ করবে না। বাড়ীতে সাহেদ নুতন লোক। তাছাড়া তার পরিচয় যা পাচ্ছিলাম তাতে করে তার দ্বারা সবই সম্ভব বলে মনে হল। অশান্ত মন নিয়ে আমি বাগানে বসে ছিলাম। টবে বেলী ফুলগুলি পাপড়ি ছড়াচ্ছিল। গেট দিয়ে সাহেদকে ঢুকতে দেখলাম। আমি একটু অস্থির পদে ওর ঘরে ঢুকার সাথে সাথেই সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার মুখের দিকে চেয়ে সাহেদ কেঁপে উঠলো। আমি ওর চোখের দিকে চেয়ে বল্লাম—ছোট মেয়েটির সর্বনাশ কেন করলে? আমার সাথে তোমার বিয়ে হয়েছে মাত্র এগার মাস। এর মধ্যেই তোমার মেয়ে মানুষের প্রয়োজন পড়ল। তুমি বিকৃত রুচির লোক। এখনই চলে যাও। এ বাড়ী-মুখো হবে না। যাও। বেরিয়ে যাও। আমার আদেশ সাহেদ অমান্য করতে পারেনি। চলে গিয়েছিল। যাবার সময়ে বলে গেল আব্বা আম্মাকে এসব বল না। তোমার ক্ষতি হবে। আব্বা আম্মা আমাকে খুবই ভালবাসতেন। সাহেদ কেন হঠাৎ চলে গেল সে প্রশ্ন বার বার করেও জবাব না পেয়ে বুঝছিলেন সত্যি একটা বিরাট কিছু গণ্ডগোল আছে।

আমার সন্তানের জন্ম হলো। ওদের বাড়ী হতে সকলেই এসেছিল। সাহেদ আসেনি। তার কিছুদিন পর সাহেদ বিলেতে চলে গিয়েছিল। মহির বয়স যখন দু'বৎসর সাহেদ ফিরে এলো। ওর মা এসে মহিকে নিয়ে গেল। আমি দিতে চাইনি। কিন্তু আমার আব্বার আদেশে দিতে হলো। বিকেলে মহিকে ফিরিয়ে দেবার কথা। কিন্তু তিনদিন কেটে গেল তবুও মহিকে পাঠাল না। আমার আব্বা মহিকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। এ সময় খবর এলো মহির অসুখ। আমাকে যাবার জন্য আমার শাশুড়ী লোক পাঠিয়েছেন। আমি অস্থির হয়ে পড়লাম। আব্বা আমাকে যেতে বললেন। আমার আব্বা নিজের দেশের বাড়ীতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করবেন বলে স্থির করেছিলেন। ঢাকার বাড়ী ভাড়া দিয়ে তিনি আমাদের দেশের বাড়ী চলে যাবেন বলে মনস্থ করলেন। মাত্র তিনদিন বাকী আমাদের বাড়ী চলে যাবার। ভাড়াটিয়া একটি ঘরে তাদের জিনিষপত্র রেখে গেছেন। আমি আর থাকতে পারলাম না। একটা রিকসা ডেকে আমি একাই চলে গেলাম ওদের বাড়ী। বাড়ীতে ঢুকে সোজা উপরে উঠে গেলাম। দেখলাম আমি যে ঘরে থাকতাম সে ঘরের খাটের উপর মহি বসে বসে কাঁদছে। আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। বুকে মুখ লুকিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল। শব্দ পেয়ে পাশের ঘর হতে সাহেদ বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে বল্ল—শরীর ওর এখন একটু ভাল হয়ে হচ্ছে। আমি বুঝতে পারলাম আমাকে এখানে আনার জন্য সে মহির অসুখ বলে খবর পাঠিয়েছে। আমি মহিকে নিয়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি অমনি সাহেদ সামনে এসে বল্ল—মহি আর তুমি এখানেই এখন থাকবে। আমি বল্লাম—না আমরা এখন চলে যাব। সাহেদের মুখটা কেমন কঠিন দেখালো। পরে কি যেন ভেবে একটু নরম সুরে বল্ল—কি দরকার আর মহিকে নিয়ে টানাটানি করার—তোমার ত আমার বাড়ীতেই থাকার কথা। এসো আমরা অতীতকে ভুলে গিয়ে আবার সহজ সুন্দর ভাবে জীবন আরম্ভ করি। আর যদি তোমার তাতে আপত্তি থাকে তবে—তুমি যেতে পার। মহি এখানেই থাকবে। মহির দিকে চেয়ে আমার সমস্ত অন্তর হাহাকার করে উঠল। তবুও মহিকে জোর করে ছাড়িয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মহি আম্মা যাব, আম্মা যাব বলে চিৎকার করতে লাগল। আমি ফিরে এসে ওর পাশে বসলাম। তিনদিন চলে গেল। রাতের দশটার ট্রেনটা চলে যেতে দেখলাম। আমার আম্মা আব্বা সে ট্রেনেই চলে যাচ্ছেন বুঝলাম। আব্বা কোন খবর নিলেন না। হয়ত ভেবেছেন যার ছেলে বউ তার কাছে আছে। তার বিষয়ে ভাবনার কি আছে। কারণ আমাদের সম্পর্কের মধ্যে কতবড় ফাটল ধরেছিল সেটা তিনি ঘুণাক্ষরে জানতেন না। ভেবেছিলেন আমাদের অভিমানের অবসান হয়েছে। বাড়ী গিয়ে তিনি আমাদের চিঠি দিয়েছিলেন। আমি সে চিঠি পেয়ে জবাবে তাঁকে আমাদের জন্য ভাবতে বারণ করলাম। লিখেছিলাম আমি ভালই আছি। বিলেত থেকে ফিরে এসে সাহেদ আরও উশৃঙ্খল হল। প্রায়ই বাড়ীতে আসত না। আমার শাশুড়ীই আমাদের চালাতেন। তার আয় বাধাধরা। কয়েকটি দোকানের ভাড়া দিয়ে তার সংসার চলে। ছোট ছেলে আলাদা হয়ে গেছে। আমাদের তিন জনার খরচ চালাতে তাঁর খুবই অসুবিধা হত। আমি তখন বি. টি. তে ভর্তি হলাম। আমার পাশ বুকে কিছু টাকা ছিল তা দিয়েই আমি পড়ার খরচ চালাতাম। কিন্তু মহির দুধ ইত্যাদি কিনে আমাকে খুবই কষ্টে চলতে হতো। একদিন আমার শাশুড়ি আমাকে ডেকে বল্লেন—সাহেদত কিছুই করছেনা, আমিত আর তোমাদের খাওয়ার খরচ চালাতে পারছি না। আমার শাশুড়ী খুবই ভাল ছিলেন। তিনি এও বলেছিলেন যে সাহেদ এর বিষয়ে সে খুবই আশাহত হয়েছেন। আমি বল্লাম—আমার জন্য ভাববেন না আম্মা—আমি আলাদা রান্নার ব্যবস্থা করছি। গলার চার ভরি সোনার বিছা হারটি বিক্রি করে দিলাম। এমনি করে আমার সমস্ত গহনা বিক্রি করে চলতে লাগলাম। সাহেদ আমাকে নিয়ে বেশী ঘাটাঘাটি করে না। সে বাইরে বাইরে কাটাতে লাগল। একদিন বাড়ী

ফিরে দেখি মহি মাটিতে পড়ে কাঁদছে। শাশুড়ী অদূরে দাঁড়িয়ে মায়েদকে গালাগালি দিচ্ছেন। মহিকে তুলে নিলাম কোলে। আমার সমস্ত কাপড় রক্তে লাল হয়ে গেল। চেয়ে দেখলাম মেরুদণ্ডের মধ্যে ছিদ্র ছিদ্র হয়ে আছে আর তা দিয়ে রক্ত ধরছে। আমি শাশুড়ীর দিকে চাইতেই তিনি বল্লেন—একটা কলস ভেংগেছে বলে বেল্ট দিয়ে মেরেছে একটা গুণ্ড ছাড়া ও কিছু নয়। কেন যে না তুমি ফিরে এলে? আমি সোজা মহিকে নিয়ে রিক্সা করে ডাক্তারের কাছে গেলাম। এ, টি, এস দিয়ে ঔষধ লাগিয়ে বাড়ী ফিরে ঘরে গিয়ে মহিকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। মহি কাঁদছিল আর বলছিল আমি এখানে থাকব না—আব্বা ভাল না। হঠাৎ কি মনে হলো আমি উঠে দাঁড়ালাম বল্লাম চল আমরা আমাদের বাড়ী চলে যাই। মহি খুশী হয়ে উঠে দাঁড়াল। আমার ননদের ছেলের বউ সেদিন বাড়ী যাবে। পুবাইল ষ্টেশনে সে নেমে যাবে। আমি তার সাথে ট্রেনে উঠে বসলাম। গাড়ী নরসিংদী পৌঁছিতে পৌঁছিতে রাত হয়ে যাবে। সেখান থেকে নাকে করে মানিক নগরে নেমে পরে নৌকায় বাড়ী যেতে হবে। আমাকে মুনা বল্ল—আমি রাতে আমার বাড়ীতে থাক, সকালে লোক দিয়ে তোমাকে ট্রেনে তুলে দেওয়া যাবে। মহির বয়স তখন সাড়ে তিন বৎসর। পুবাইল পৌঁছে নৌকা করে মুনার গাঁয়ের বাড়ীতে পৌঁছাই। মুনার মা বুড়ো মানুষ। আমাদের দেখে খুশী হলেন। গ্রামের বাড়ী হাট বাজার সপ্তাহে দু'বার। তাতে একা মানুষ। কোন রকমে আলু ভাত বেগুন ভর্তা দিয়ে নিজের একার খাবার সেরে নেয়। আমাদের দেখে তিনি এত রাতে কি যে খাওয়াবেন তাই ভেবে অস্থির হচ্ছিলেন। আমি বল্লাম আমাদের জন্য ভাববেন না। রাতে না খেলেও চলবে। তবে যদি সম্ভব হয় মহির জন্য একটু দুধের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। তিনি হেসে বল্লেন—ভাত ও দুধের ব্যবস্থা গ্রামের প্রত্যেক বাড়ী-তেই হবে ক্রিস্ত মাছ তরকারী সম্ভব নয়। আর এমন সময় এসেছ মা—যখন আমার মুরগীগুলো সব মরে গেছে। এবার গ্রামে মুরগীর মড়ক দেখা দিয়েছে। কোথাও একটা ডিম পাবে না। আমি মহিকে নিয়ে একটা মাদুরে শুয়ে পড়লাম। মুনাও আমার পাশে শুয়ে পড়ল। মহিকে দুধ খাইয়ে শুইয়ে দিয়েছিলাম।

(চলবে)

শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প

—সালমা শহীদ চৌধুরী

শহরের নাগরিক জীবন আজ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। অপর দিকে জীবিকার সন্ধানে অগণিত মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে ভীড় জমাচ্ছে। শহরে গড়ে উঠছে বস্তি। বিভিন্ন স্থানে রাস্তার ধারে ছিন্নমূল মানুষ গড়ে তুলছে তাদের অস্থায়ী আস্তানা। বাসস্থানের অভাব, নোংরা পরিবেশ, চিত্তবিনোদন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অভাব, বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি, অপরাধ প্রবণতা ও অসামাজিক কার্য্যকলাপ, রাহাজানি ইত্যাদি বিবিধ সমস্যায় শহরের জনজীবন আজ হয়ে উঠেছে দুর্বিসহ ও বিষাক্ত। এই শহর জীবনকে সুন্দর ও পরিকল্পিত ভাবে গড়ে তোলার জন্য সৃষ্টি হয়েছে সমাজ কল্যাণ বিভাগের "শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প।" শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প সমাজ কল্যাণ বিভাগের আওতা-ধীন অন্যতম বৃহত্তম কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হচ্ছে শহরাঞ্চলে বসবাসরত বিশেষ করে শহরের বস্তি এলাকাতে যে সব স্বল্প আয়ের লোকজন বসবাস করেন তাদেরকে সংগঠিত করে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগি-তার মাধ্যমে তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের কার্য্যক্রম গ্রহণ করা।

আজ থেকে প্রায় সাতাশ বৎসর পূর্বে জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ-দের পরামর্শ অনুসারে ১৯৫৫ ইং সালে ঢাকা শহরের কায়েতটুলি এলাকায় প্রথম পরীক্ষামূলক ভাবে শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই এই প্রকল্পের সফলতা বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হওয়ায় এই কর্মসূচী তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পাঁচসালা পরিকল্পনাধীনের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তারপর ঢাকা শহরের মোহাম্মদপুর, গোপিবাগ, লালবাগ এলাকায় এই প্রকল্প চালু হয়। এই প্রকল্পগুলি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হওয়ায় ১৯৬০ সালে সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন শহরে আরো ১২টি শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প চালু হয় এবং এই প্রকল্প সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬টিতে। ১৯৬১ ইং সালে সমাজ কল্যাণ পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রকল্প অন্যান্য শহরে প্রসার লাভ করে।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার সমাজ কল্যাণের বিভিন্ন প্রকল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করায় এই প্রকল্প দ্রুত প্রসার লাভ করে। ১৯৮০ সাল পর্য্যন্ত বাংলাদেশে ৬৮টি প্রকল্প চালু হয়। তারপর ১৯৮১ সালে আরো ১২টি প্রকল্প চালু করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৮০টি প্রকল্প চালু রয়েছে। ৮০টি প্রকল্পের মধ্যে ঢাকা বিভাগে রয়েছে ২৩টি প্রকল্প, চট্টগ্রাম বিভাগের আওতাধীন হচ্ছে ২১টি প্রকল্প, রাজশাহী বিভাগে হচ্ছে ১৭টি এবং খুলনা বিভাগের অন্তর্গত হচ্ছে ১৮টি প্রকল্প। প্রকল্পগুলি শুধু জেলায় অবস্থিত নয়, ইহা বিভিন্ন মহকুমায় এবং কয়েকটি থানায় অবস্থিত।

প্রতিটি শহরের পৌর এলাকা এই প্রকল্পের আওতাধীন। প্রকল্প কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক প্রকল্পে নিযুক্ত আছেন ২ জন সমাজ কল্যাণ সংগঠক (একজন মহিলা আর একজন পুরুষ) আর দুই থেকে চার জন পর্য্যন্ত মহল্লা কর্মী, একজন মুদ্রাক্ষরিক যুক্ত সহকারী এবং একজন পিয়ন। এছাড়া প্রত্যেক প্রকল্পে রয়েছে একটি প্রকল্প পরিষদ। যে পরিষদের মাধ্যমে প্রকল্প সকল কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। সাধরণতঃ শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক ও জাতি গঠনমূলক বিভিন্ন সরকারী দপ্তর ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি এবং সমাজ কল্যাণ-মূলক কাজে উৎসাহী স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এই প্রকল্প পরিষদ গঠিত হয়ে থাকে। এই পরিষদের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের সমস্যাসমূহ ও স্থানীয় সম্পদ-সমূহ পর্য্যালোচনা পূর্বক স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সমিতি বা সংস্থাসমূহ ও স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন ধরণের সমাজ কল্যাণ মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

প্রকল্প পরিষদ স্থানীয় সম্পদের সাথে সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতায় সমন্বয় ঘটিয়ে প্রকল্প এলাকায় সমাজ কল্যাণ মূলক কর্মসূচী জোরদার করে থাকে। এইসব কর্মসূচী সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য তহবিল গঠন করা হয়। পরিষদ স্থানীয় স্বচ্ছল জনসাধারণকে সমাজ কল্যাণ মূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করে থাকে ও সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সমস্যাযুক্ত জনসাধারণকে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে এবং নিজেদের সমস্যাসমূহ সংঘবদ্ধভাবে মোকাবেলা করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

শহরাঞ্চলে বসবাসরত জনগণের বিভিন্নমুখী সমস্যাবলীর মধ্যে অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, বেকারত্ব, জনসংখ্যার আধিক্য, অপরাধ প্রবণতা, ভিক্ষাবৃত্তি, রাহাজানী,

নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতি সমাধানের জন্য প্রয়োজন রয়েছে জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী যৌথ প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন। শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প নিম্ন বর্ণিত কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে জনসাধারণের সঠিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার ব্যস্ত আছে :

১। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য স্বল্প আয়ের ও দরিদ্র পরিবারসমূহের আয় বৃদ্ধির জন্য এবং বেকার যুবকদের আয়ের পথ সুগম করে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরণের কারিগরি ও কুটির শিল্পের প্রশিক্ষণ চালু রয়েছে যেমন— সূচী শিল্প, পাটের কাজ, পোষাক তৈরী, বাঁশ, বেতের কাজ, নারিকেলের ছোবড়ার কাজ, কাঁচের চুড়ি, আয়না তৈরী, ভাঁজাও টাইপ, শর্ট হ্যাণ্ড, রেডিও মেরামত, ফটোগ্রাফী ইত্যাদি।

২। শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় বহির্ভূত ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক শিক্ষা ইত্যাদি এবং বয়স্কদের জন্য অক্ষর জ্ঞান ও সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৩। জনসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশের এক বিরাট সমস্যা। এই সমস্যা মোকাবেলা করবি জন্য শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণকে সজাগ করা এবং পরিবার উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে।

৪। পরিবেশ উন্নয়ন শহর অঞ্চলে বিশেষ করে বস্তি এলাকার পরিচ্ছন্নতা ও বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা এবং তাদের সক্রিয় সহযোগি-তায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা।

৫। বিভিন্ন অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বেকার যুব দলকে গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে চুরি-ডাকাতি ও অন্যান্য অসামাজিক ক্রিয়া-কলাপ থেকে এলাকাকে মুক্ত রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

৬। ইহা ছাড়া বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিদর্শন ও তাদের বিভিন্ন কর্মসূচীকে বাস্তবায়নে সাহায্য ও সহযোগিতা করা।

এইরূপে শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রকল্প এলাকায় জনসাধারণ এবং এলাকার পরিবেশ উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত আছে।

বিচ্ছিন্ন ভাবনা

—সত্যসন্ধানী

এটা খুবই সত্যি কথা, জোর করে কিছু লেখা যায় না, করাও যায় না। তবুও কিছু লিখতেও হয়, করতেও হয়। তা না হলে কোন কোন সময় আবার মানও থাকেনা। অবশ্য মান-সম্মানের প্রশ্নটা ততটা মুখ্য নয়, ধরতে গেলে এক রকম গৌণই বলা যায়। কারণ দিন দিন প্রতিদিন যে তাগাদা তাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। অবশ্য তাগাদা দেয়া রোকেয়া আপার একটা মজ্জাগত ব্যাপার। এটা বলতে পারা যায় তার একটা হ্যাবিট। অবশ্য প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করবার এটা একটা তার কায়দাও বটে। কিন্তু কোন কায়দা নেই। আমি যথা পূর্বম্ তথা পরম্। একটা সত্যি কথা এখানে না বললেই নয়—আমার লেখার অভ্যাসটা ছোট বেলা থেকে হলেও নিয়মিত ছিলনা। বলতে পারা যায় নিয়মিত-ভাবে অনিয়মিত। যাকে সুন্দরভাবে ইংরেজীতে বলা চলে রেগুলারলি ইরেগুলার। আর ইরেগুলার হবেই বা না কেন? পরিশ্রমের কোন মর্য্যাদা আছে? কার জন্য? কিসের জন্য? কেনই বা এত পরিশ্রম? তবে চিরাচরিত নিয়ম নাকি এটা! তুমি এটা ভাল জান—সুতরাং তোমার কাজ ওটা করবার, এটা নয়। আর সে ওটা জানে—তবে তার এটা করতে হবে। আপনি বলুন ত তবে এটাই বা করবেন কেন—ওটাতেই বা যাবেন কেন? হ্যাঁ, তবে এটা কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। তাই তার ইচ্ছেতেই বকরি আমার লেজেই কাটতে হবে। সব তাঁরই ইচ্ছা। এটা নাকি সুষ্ঠুভাবে চলার নীতি বা গতি। প্রকৃতিও বলতে পারেন। আর তাই আমাদের যোগ্যতা যখন যাচাই করবার ক্ষমতা নেই, তার জন্যই দুর্গতি। আর তাতেই নাকি উন্নতি। আর ভোগান্তি এই ইতর জনের। আপনার কিন্তু এতে সোচ্চার হবার জো নেই, কারণ—এটা নির্দেশ—আপনি তা ভাল ভাবে পারেন বা নাই পারেন। জানেন বা নাই জানেন। বোঝেন বা নাই বোঝেন। এটাও তাঁরই ইচ্ছা। আর আমরা তাঁর ইচ্ছার গোলাম মাত্র। যার লক্ষ্যে আমরা উপলক্ষ্য—তার স্বার্থে কতটুকু লক্ষ্য রাখা হল—তার বিচারের ভার ত আর আমাদের উপর নয়। আর আমরা কে যে, এত বড় লক্ষ্যের বোঝা বইবার ক্ষমতা আমাদের থাকবে? আমরা ত ভারবাহী পশু—মানে-বিষ্ট অব বারডেন।

শুধু এ কথাগুলোই রোকেয়া আপা বুঝতে চায় না, নয়ত বা তাঁকে বোঝাতে পারি না। কিন্তু আমার যতদূর মনে হয়, হয়ত বা এটাও তার····যাক গিয়ে। এসব ভাবনা ত আমাদের ভাবনার নয়। আমরা শুধু তাঁদের ভাবনার ভারই বহন করবো। তাদের বিজ্ঞার পুরস্কারস্বরূপে মাথার নিয়ে দিনাতিপাত করবো বিকারগ্রস্ত হয়ে।

এই যাঃ—কি যাচ্ছে তাই বলে যাচ্ছি। আসল কথাই ত বলা হচ্ছে না, কেবল নকল নিয়েই পাড়াপাড়ি। দুৎ ছাই এত ভাবনা চিন্তা করে কি আর অচিন্তনীয় কিছু করতে পারা যায়? সোজা কথা সোজা রাস্তায় চলো। কিন্তু কি নিয়ে চলা শুরু করি। দিই দিচ্ছি করে অনেকদিন কাটিয়ে দিলাম। কথা দিয়েছি কিন্তু কথা রাখব কি করে? সময় ত আর আমার জন্য বসে থাকবেনা। কথা দিয়ে ত কথার পাহাড় জমানো যায়। কিন্তু তাতে লাভ? হিসাবের খাতায় ত শূন্যই।

আমি যদি বলি এই বিচ্ছিন্ন ভাবনাই আমাদের দুর্ভাবনার মূল। তাতেই বা কি? তবে হ্যাঁ, একটা ঘটনা বলি। মনে কিছু নিবেন না। এটা কিন্তু একটা অতি সত্য—বাস্তব ঘটনা। বাস্তবকে অস্বীকার আমরা করি বটে, কিন্তু পারি কি বাস্তব ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে? না তা হয় না। আর তা হয় না বলেই ঘটনাটা বলি—শুনুন।

জানিনা মাসটা কোন মাস ছিল—তবে শীত তখন পড়েছে বেশ জেঁকেই। বোধ হয় নভেম্বর কি ডিসেম্বর হবে। আমরা জনা পাঁচ। সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে সিনেমার বিকৃত পোষ্টার দেখছি। প্রায় ১৭/১৮ বছর আগের ঘটনা ঢাকা থেকে ১০ মাইল দূরে। যাক বলিই বা না কেন? নারায়ণগঞ্জের একটি সিনেমা হলের ধারে দাঁড়িয়ে আছি আমরা পাঁচ জনা। ছুটির দিন। বিকালে ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ বেড়াতে এসেছি। সিনেমার টিকিট কাটার জন্য লাইন দিয়েছি। লাইনটা মোটামুটি বড়ই। আমরা সবার পিছনে। কিছু সমাজ (?) লোকের সলাজ যাতায়াত দেখে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি পাশেই "নিষিদ্ধ এলাকা"। "লাল ক্রস" চিহ্নটা দেখে কৌতূহল হল। একটা প্রচ্ছন্ন উত্তেজনা যে অনুভব করলাম না—তা বললে অবশ্য মিথ্যাই বলা হবে। বলতে কি—পাঁচ জনই যেন একটা কিসের আকর্ষণে 'ক্রসচিহ্ন'টা পার হয়ে ঢুকে পড়লাম নিজেদের অজ্ঞাতেই। সবার পিছনে আমি। সবার সামনে আমাদের সাহসী (?) বন্ধু। ওর হাঁটা চলা দেখে মনে হল—এলাকাটি ওর পরিচিত—কিন্তু অত্যন্ত যে নয় তা ওর ভীরু চাহনীতেই মনে হলো। ছোট গলি। দু'পাশেই সারি সারি সারবাধা ছোট ছোট ঘর। এতসরু গলি

যে ২/৩ জন পাশাপাশি হাঁটা যায় না। তার মধ্যে আবার সারিবদ্ধ হয়ে রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে উৎসব সাজে সজ্জিতা ললনারা। মনে হলো নগরীর নটী চলে অভিসারে, যৌবন মদে মত্তা, অঙ্গে আঁচল সুনীল বরণ, রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ। কৃত্রিম রঙে পালিশ করা ঠোঁট—মুখ রঞ্জন—কাজল টানা ভুরু, কিন্তু কোন কিছু যেন ওদের হৃদয়ের বেদনাকে ঢেকে রাখতে পারছেনা। নয়ত বা উচ্ছল যৌবন বিজ্ঞাপনে ব্যর্থ হয়েছে ওদের জীবন যন্ত্রণা। চারিদিকে বৃদ্ধ তরুণ—হয়তবা সমবয়সী এক দঙ্গল ছেলের দল ওদের মনে চঞ্চলতা এনে দিয়েছে। চারিদিকে যেন একটা কিসের নীরব ব্যস্ততা—ফিস ফাস চাপা গুঞ্জন। গুমট বদ্ধ হাওয়ায় একটা উগ্র সস্তা সেন্টের গন্ধ। মনটা কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠল। হৃৎপিণ্ডের ওঠানামার শব্দটা যেন আমার নিজের কানেই বেসুরো লাগছিল। আমাদের সাহসী (?) বন্ধু বোধহয় চটুল হাসিতে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মেয়েকে কি যেন জিজ্ঞাসা করলো। হিল্লোল হাসিতে মেয়েটি কি জবাব দিল তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। বুঝলাম হয় ত বা দর কষা-কষি চলছে। হঠাৎ সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি চটুল হাসিতে ফেটে পড়লো। পাশের মেয়েটাও এতে যোগ দিল। মুহূর্তে সংক্রামিত হয়ে পড়লো সে হাসিটা চারিদিকে। বন্ধুবর যে ঘাবড়ে গেল সেটা আমি দূর থেকেও বুঝতে পারলাম। সহসা এর মাঝেই চোখ পড়লো দূরে কোণে, প্রায়ান্ধকারে কে যেন সজল কাজল চোখে আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। আমাকে কি যেন বলতে চাইছে। আমি বিচলিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু কোন কথাই আমার মুখ ফুটে বেরুলনা। আমি তার দিকে এগুতে চাইলাম, আমার পা সরলনা। কাছে ডাকতে চাইলাম 'না' বেরুলনা। কিছু বলতে চাইলাম, কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে রইল। পঞ্চ শরের বেদনা মাধুরী দিয়ে বাসর রাত্রির কল্পনা আমার ছিল না কিন্তু কেন জানিনা তবুও হৃদয়ের মাঝে একটা অব্যক্ত বেদনা অনুভব করলাম। মেয়েটি কি বলতে চায়—কি তার অভিযোগ? আমি কিন্তু নিস্তব্ধ নির্বাক। আমার মন বলছে আমি যেন তার মনের সব না-বলা কথাই বুঝতে পেরেছি। আকুল হৃদয়ের ডাগর চোখের নীরব ভাষা আমি যেন উপলব্ধি করতে পেরেছি। ওর মনে যেন কিসের ব্যাকুলতা—কিসের বুকভরা তার অভিমান। এই রহস্যপুরীর আর সব মেয়েদের থেকে ও যেন স্বতন্ত্র—বিচ্ছিন্ন। আমার মনের অবচেতন কোণে কিসের অনুভূতি জানিনা—হঠাৎ করেই 'বেদের' একটা শ্লোক মনে পড়ে গেল। মনে হলো ও যেন বলতে চাইছে:—

"অসৎ হইতে মোরে সতে নিয়ে যাও
জ্ঞানের আলোক জ্বেলে আঁধার ঘুচাও"

আমার ওর সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল, মেয়েটা চোখ নামিয়ে নিল। এমনি সময়ে হঠাৎ এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। কোথা থেকে এক পাঁড় মাতাল সহসা কোনদিক থেকে এসে মেয়েটিকে মনে হলো যেন এক রকম জোর করেই [illegible] টেনে নিয়ে গিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। মেয়েটি চীৎকার করে উঠতেই মনে হল কে যেন ওর মুখ দু'হাতে চেপে ধরেছে। স্তব্ধ হয়ে রইলাম ঘটনাটা দেখে। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই চুপ। মনটা ব্যথায় ভরে গেল। মেয়েটির আর্তবেদনা যেন বলছে—

অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তরতর হে
নির্মল কর, উজ্জ্বল কর, সুন্দর কর হে।

হঠাৎ সম্বিত ফিরল পাশের মেয়েটির পুলকিত কণ্ঠ আর মদির কটাক্ষে, নাগর যে সম্বিত হারা। তারপর আবার সেই উচ্ছ্বসিত হাসি। লজ্জা পেলাম, কি সব ভাবছি বলে। বন্ধুটি তাড়া দিল, বলল, চল, অসহ্য লাগছে। ওপাশ দিয়ে বেড়িয়ে যাই।

আমরা তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়লাম। পাশের পানের দোকানের রেডিওতে তখন বেজে চলছে রজনীকান্তের একটা গান—

তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে
মলিন মর্ম মুছায়ে,
তব পুণ্য-কিরণ দিয়ে যাক মোর
মোহ কালিমা ঘুচায়ে॥
লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে
জানিনা কখন ডুবে যাবে কোন
অকূল গরল পাথারে।
প্রভু, বিশ্ব বিপদ-হন্তা
তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থ:
তব শ্রীচরণ তলে নিয়ে এস মোর
মত্ত বাসনা ঘুচায়ে॥

আজ ১৭/১৮ বছর পরেও ঘটনাটি বার বার আমার মনে নাড়া দেয়। কেউ কি এসেছে এদের সমস্যা বুঝতে জানতে? না, এসেছে মূল সমস্যা সমাধানে স্নেহ ভরা মন নিয়ে আলোর সন্ধান দিতে। এই নির্যাতীত নারীত্বের অবমাননা কি যুগের পর যুগ অন্ধকারের দেয়াল ডিঙিয়ে কোন দিন আলোয় আসতে পারবে না? প্রাচীন যুগে যারা ঘৃণ্য সমাজ ব্যবস্থাকে কি আঘাতে আঘাতে নিখাদ সোনায় পরিণত করতে এগিয়ে আসবেনা আমাদের এই সমাজ

ব্যবস্থার কর্ণধাররা ? আজও দেখতে পাচ্ছি সেই কালো কাজল চোখে নীরব ভাষায় আমাদের সমাজকে প্রশ্ন করছে, তোমরা কি কেউ নেই যারা আমাদের মত অসহায়দেরকে আলোর সন্ধান দিতে পার ? তোমরা কি এমন কেউ নেই আমাদের হৃদয়কে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে ? তোমরা আমাদের অন্ধকারে ঢাকা সমাজের এই কালো কালিমাখা জীবনকে আলোর আলোয় ভরিয়ে দাও। আমরা বাঁচারমত বাঁচতে চাই। তোমরা আমাদের হাতধরে আলোর সন্ধান দাও—আমরা যে পথ চিনি না। আজো যেন শুনতে পাচ্ছি তার নীরব মনের আকুলি।

"অসৎ হইতে মোরে—সতে নিয়ে যাও
জ্ঞানের আলোক জেলে—আঁধার ঘুচাও॥"

এদের নীরব আকুল আহবানে এগিয়ে আসবে কি আজ আমাদের এই কল্যাণ মুখী সমাজ ?

* * * *

হঠাৎ করে মনে পড়লো রোকেয়া আপা ত আজই আবার তাগাদা দেবেন। না একটা কিছু দাঁড় করাতেই হবে। রোজ রোজ কি আর দুর্ভাবনায় দিন কাটানো যায়। বিচ্ছিন্ন ভাবনা আবার আচ্ছন্ন করে তুলল সারাটা মন। তবে হ্যাঁ, আজ কথা আমি রাখবই। একদিনের কথা বলি। বিশ্বাস করুন একেবারে নির্ভেজাল সত্য।

গভীর আঁধার রাত—মাইক্রোবাসটা চলছে বেশ দ্রুত গতিতেই রমনা পার্কের গাঁ ঘেষে! গাড়ীতে আমরা বেশ কয়জনা। নীচে বসা কিছুক্ষণ আগে পার্ক থেকে ধরা ৩/৪ জন নগর অভিসারিকা। ওদের কিন্তু দেখে মনে হলো যেন চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই—ভয় ভাবনা বা দুর্ভাবনারও কোন ছাপ নেই। কিছুক্ষণ আগে এদের মাঝে একটি অল্প বয়সী মেয়ে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, স্যার আমাদের কোথায় ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের মাঝে একজন রেগে বলল, চুপ করে বসে থাক। ক্যাট ক্যাট করিস না। তোদের জন্য আজ সারাদিন অফিস করেও আবার রাত্রে ডিউটি। চুপ কর। সারাদিন পরিশ্রমের পর এই প্যাচ প্যাচ ভাল লাগে? শয়তানগুলি হাড়ে হাড়ে জ্বালাচ্ছে। চলে যেতে পারিস না শহর ছেড়ে দেশে, গ্রামের বাড়ীতে?

বলেন কি স্যার, আমাদের বাড়ী কোথায়, যে বাড়ী যাব! শহরের এই অন্ধকার রাজ পথেই তো আমরা রচনা করেছি আমাদের প্রতিদিনের বাসর সজ্জা। আমাদের কর্মক্লান্ত সারাদিন কাটে পার্কের সবুজ ঘাসে গা এলিয়ে—হোটেলের পাশে—রাস্তার মত বুভুক্ষু কুকুর গুলির সাথে মারামারি করে। নামে সন্ধ্যা—চঞ্চল হয়ে উঠি—কুকুরগুলির আশার প্রতিক্ষায়। স্যার, রাতের কালো অন্ধকারইতো আমাদেরকে জীবনের সন্ধান দেয়। তার কালো হাত ছানিতেই ত আমরা নিজেদেরকে খুঁজে নেই। বিলিয়ে দেই নিঃশেষে নিজেদেরকে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর দুর্নিবার ক্ষুধার কাছে। এইতো আমাদের জীবন। আবার দিনের আলোয় হারিয়ে যাই। এইভাবেই চলে আমাদের জীবনের পথ পরিক্রমা।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন তোমরা এই পথে এসেছ? সহজ সরল সুন্দর জীবনে কি তোমাদের ফিরে যেতে ইচ্ছা করে না?

—না।

—কেন?

—কে দেবে আমাদের আশ্রয় ? কে নেবে আমাদের ঘরণী করে ? কে শোনাবে বাঁশী? কোথা পাবো অনিন্দিত সুন্দরের হাসি? মুতুরা সেনাস ভরিয়া করেছি পান নয়ন নির্যাস। আমরা অবাঞ্ছিত—অপাংক্তেয়—সমাজের ঘৃণ্য—দেশের জঞ্জাল। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে?

আমি চুপ করে থাকি।

জানেন স্যার, আমারও ঘর ছিল। ছোট এক ছেলে ও বৃদ্ধ স্বামী নিয়ে সুখের সংসার ছিল। চুপ করে থাকে সে। গভীর দীর্ঘশ্বাস নেমে আসে তার বুকের ভিতর থেকে। আমি কোন কথাই বলিনা। সে আবার বলে, শুনবেন স্যার—আপনাদের ধৈর্য্য হবেত শুনবার? বলতে থাকে সে, একদিন গ্রামের লম্পট মাতাল মাতব্বরের চোখ পড়ল আমার উপর। নানাভাবে আমাকে সে প্রলোভন দিতে থাকে। একদিন রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসে আছি—রাত তখন গভীর। ছেলেটির ক'দিন থেকেই ভীষণ জ্বর। পয়সার অভাবে ঔষধ দিতে পারি না। স্বামী রুগ্ন শয্যাগত। অভাবের তাড়নায় জর্জরিত। এমন সময় ঘরের দরজায় পায়ের শব্দে শিউরে উঠলাম। দেখি দরজায় দাঁড়িয়ে সেই মাতাল লম্পট মাতব্বর। আমি চীৎকার করবার চেষ্টা করতেই মুখ চেপে ধরল। আমাকে জোর করে ঘরের বাইরে টেনে আনল। আমার অনিচ্ছায় জোর করে আমার দেহের পবিত্রতা নষ্ট করল। তারপর কিছু টাকা আমার সামনে ফেলে দিয়ে বলল, ছেলেকে ঔষধ খাওয়াস। আবার আসব, বলে চলে গেল। ঘৃণায়, লজ্জায় নারীত্বের অবমাননায় আমার বুকে তখন বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। আত্মহত্যা করতে চাইলাম, কিন্তু রুগ্ন ছেলে ও শয্যাগত রুগ্ন স্বামীর কথা ভেবে মরতে পারলাম না। কিসের এক সম্মোহনী শক্তি আবার আমায় ঘরের ভিতর নিয়ে আসল। পরের দিন রাত্রিতে আবার সেই শয়তান এসে হাজির,

কেন জানি পারলাম না ফিরিয়ে দিতে। তার কাছে ছেলের চিকিৎসার জন্য আরো টাকা চাইলাম সেদিন। চলল আমার গোপন অভিসার। লালসার কামনায় আত্মাহুতি দিলাম নিজেকে। কিন্তু এই করেও ত ছেলেকে, স্বামীকে বাঁচাতে পারলাম না। এরমধ্যে পাপের গভীরে নেমে গেছি, ফেরবারও আর পথ নেই। বৃদ্ধ স্বামীও আমার মত কলংকিনীর হাত থেকে এর মধ্যে রেহাই পেয়ে চলে গেছে। হুঁস হল সেদিন যেদিন মাতব্বর আমাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিল। তখন আমার পা তখন কাল ব্যাধির দংশ দংশে না। প্রতিশোধ নিতে চাইলাম। কিন্তু গ্রামের মাতব্বরের সাথে আমার মত অনাথা পারবে কেন? কলঙ্ক ঢাকতে চলে এলাম ঢাকায়। তা আজ প্রায় মাস খানেক হল। তারপর থেকে—বলেই চুপ করে গেল।

ইতিমধ্যে পাশের ১৪/১৫ বৎসরের মেয়েটি বলে ওঠে, স্যার।

—চুপ কর হারামখোর, মরতে পারিস না। আমার পাশে বসা বন্ধুটি এবার ধমকেই উঠলো।

—আঃ বলতে দাওনা ওকে কি বলতে চায়।

—স্যার, মা বাপ হারিয়ে ছোট ভাই আর আমি মাস দু'এক আগে বরিশাল থেকে ঢাকা আসি। সদরঘাটে লঞ্চ থেকে নেমে লোকারণ্যের মাঝে হাঁপিয়ে ওঠি। রাত তখন ১০টা এগারটা হবে। কি যে করি চিন্তা করতে করতে টার্মিনালের বাইরে এসে দাঁড়াই। একজন বৃদ্ধ ঠেলা গাড়ীর নীচে কাঁথা জড়িয়ে বসে ছিল। ছোট ভাইয়ের হাত ধরে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, বাবা, আমাদের একটু আশ্রয় দেবেন? শুধু আজকের রাতটা। কাল ভোরে কোন বাসায় কাজের যোগাড় করে নেব। বৃদ্ধ ঠেলাওয়ালা আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো, নতুন এসেছ ঢাকায়? বললাম, হ্যাঁ।

—কিন্তু মা, এযে বড় কঠিন ঠাই। তোমাদের কোথায় আশ্রয় দেই। আমিত কোন রকমে এই ঠেলা গাড়ীর নীচে রাত কাটাই। জায়গাটা ভাল না। তাছাড়া তোমার এই বাড়ন্ত বয়স। অনুনয়ে বলি, শুধু আজকের রাতটা একটু আশ্রয় দিন বাবা।

—তাও বুঝলাম। কিন্তু রাতটাই যে ভয়ঙ্কর মা। বেশ, তুমি ঠেলাটার ও পাশে গিয়ে শোও। তোমার ভাই আমাদের মাঝখানে থাকুক। কিছু খেয়ে নাও।

—না কিছু খাব না। লঞ্চে আমরা কটি খেয়ে নিয়েছি। খিদে নেই।

রাত তখন গভীর। নতুন জায়গায় কিছুতেই খোলা আকাশের নীচে ঘুম আসছিল না। ছোট ভাই আর বৃদ্ধটি অঘোরে ঘুমাচ্ছে। হঠাৎ আমার প্রায় কাছেই একটা মোটর গাড়ী এসে থামলো। আমি ভয়ে জড়ো সড়ো হয়ে মরার মত পড়ে রইলাম। সারি সারি তখন অনেক লোক রাস্তায় ফুটপাতে ঘুমাচ্ছে। ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে দেখি গাড়ী থেকে একটা লোক নামছে, হাতে টর্চ লাইট। টর্চ এর আলোয় সে লোকটি এদিক ওদিক কি যেন খুঁজে ফিরছে। আমি ভয়ে চোখ বুজে রইলাম। আমার সমস্ত শরীর ভয়ে শিউরে উঠলো। একেইত ঢাকায় নতুন এসেছি, কিছুই জানিনা। তারপর লোকটার ঘোরাফেরা দেখে গাটা ছমছম করতে লাগলো। হটাৎ টর্চের আলো আমার মুখের উপর এসে পড়ল। আমি তখন ভয়ে জড়সড়। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। লোকটা পা দিয়ে আমার শরীরে ঠেলা দিয়ে বলল, এই উঠ। আমার তখন কোন চেতনা নেই। আমি কিছু বলবার আগেই লোকটা আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে উঠালো। আমি কেমন যেন নির্বাক হয়ে গেছি। সমস্ত শক্তি আমার লোপ পেয়ে গেছে। গাড়ী ছুটে চললো। কতক্ষণ পরে গাড়ীটি একটা বেশ বড় দালানের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। সেখানে আরো দুই তিনজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে ওরা পাঁজা কোলে করে উঠিয়ে দালানের একটা কোঠার মেঝেতে শুইয়ে দিল। তারপর আর আমার কিছুই মনে নেই...। যখন ঘুম ভাংলো তখন সদর ঘাটের কর্ম ব্যস্ততা পুরোদমে চলছে। সারা গায়ে ভীষণ ব্যথা অনুভব করলাম। মাথাটা সোজা করে রাখতে পারলাম না। আবার শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে আবার চেষ্টা করে ওঠে বসলাম। প্রচণ্ড ব্যথায় আমার সমস্ত শরীর তখন কুঁকড়ে যাচ্ছে। গায়ের আঁচলটা টানতেই দেখলাম পাঁচটা দশ টাকার নোট গিট দেওয়া। রাতের কথা আমার তখন সবটাই মনের মধ্যে ভেসে উঠল। ভাইয়ের খোঁজ নিলাম, পেলাম না। জনারণ্যে কোথায় যে সে হারিয়ে গেছে আজও তা জানিনা। বৃদ্ধ ঠেলাওয়ালাকেও দেখলাম না। এদিকে ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছে। টাকাটি হাতে নিয়ে সামনের হোটেল থেকে কিছু খাবার কিনলাম। হোটেলের বয় হাসিমুখে বলল, কিগো কবে আসলে। নতুন আমদানী মনে হয়। কথা না বলে চুপ করে রইলাম।

শুরু হলো আমার অভিশপ্ত জীবন। বলুনত স্যার, আমার এই অবস্থার জন্য দায়ী কে?

সত্যইত এ দুটি মেয়ের জীবনের মূল্যবোধের অবমাননার জন্য দায়ী কে? ওরা? না, আমাদের এই সমাজ? জীবনের মূল্যবোধকে বিক্রী করে আজ ওরা দেহ পসারিনী। আজ

ওরা পতিতা, ঘৃণিতা। সভ্য সমাজের করুণার পাত্র। সুখী সুন্দর জীবনের স্বপ্নও ওরাও একদিন দেখেছিল। কিন্তু কাল বৈশাখীর মত ছোবল এদের জীবনকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল। এজন্য দায়ী কে? ওদের মত এটাও আমারও চিরন্তন জিজ্ঞাসা। দায়ী কে? এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? নিজের অসহায় অবস্থার কথা মনে করে নিজেই যেন কেমন সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম।

সহসা জানিনা কেন, ওদের প্রশ্ন করলাম, এস না তোমাদের নতুন জীবনের সন্ধান দেই? তোমরা আজ থেকে সব লাঞ্ছনার গ্লানি ধুয়ে মুছে—আবার নতুন মানুষ হয়ে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াবে। তোমাদের মীরপুর ক্যাম্পে নিয়ে যাবে। তোমাদের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের সুস্থ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা হবে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তোমরা রোজগার করবে। আর কোন অভাবই থাকবেনা। কোন ভয় নেই। কিন্তু নির্ভয়ই বা দিতে পারলাম কই?

সহসা ঐ দুটি মেয়ে আমাকে প্রায় এক সাথেই বলে উঠল, স্যার, আপনার কথাই মেনে নিলাম। কিন্তু আমাদের জীবনের ক্ষুধা মেটাবে কে? সুধা দেবে কে? মানুষ হয়ে আমরা কি করব? আপনাদের আজকের এই সমাজ আমাদের কি গ্রহণ করবে? পারবে কি আমাদের ঘরনী করে গৃহে স্থান দিতে? তবে কি অধিকার আমাদের, সমাজে বেঁচে থাকবার? মৃত্যুই আমাদের শ্রেয়ঃ। সুস্থ মন নিয়ে কি এগিয়ে আসবে কোন বিবেকবান সমাজ কর্মী? হাতে ধরে হয়ত বা তাঁরা আমাদের আলোর সন্ধান দিবার জন্য এগিয়ে আসবে। কিন্তু সেই আলো আলেয়ার মত আমাদের প্রতারণাই করবে। আমরা কি সত্যিই সমাজে ঠাঁই করে নিতে পারব? আমাদের সহজ সরল জীবনের মূল্যবোধ কি আমরা ফিরে পাব, স্যার?

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে ওরা দুজনাই। ওদের জীবন জিজ্ঞাসার জবাব কি আমরা দিতে পেরেছি? কবির ভাষায় কি বলতে পারি, "পতিতোদ্ধারিনী স্বর্গ স্খলিতা, জাহ্নবী সম বেগে জাগো পদ দলিতা, মেঘে আনো বালা বজ্রের জ্বালা, বিশ্ব দাহন তেজে জাগো দাহিকা।"

রাত্রি প্রায় শেষ—মাইক্রোবাস এসে থামলো ভবঘুরে গ্রহণ কেন্দ্রে। গাড়ীর সবাই নেমে গেল। আমি একা রাজপথ দিয়ে চলেছি।

গভীর রাতের ও দু'টো মেয়ের চোখের চাহনী আজো কেন জানি উন্মনা করে তোলে আমাকে—
ভ্রূবিলাস শেখে নাই যারা সেই নারী—।
জন পদবধুজন গগনে নেহারী
ঘনঘটা। ঊর্দ্ধনেত্রে চাহে মেঘ পানে
ঘননীল ছায়া পড়ে সুনীল গগনে।

আজও আমার ব্যাকুল জিজ্ঞাসা—এর সমাধান কি হবে না? এ জিজ্ঞাসার জবাব দেবে কে?

বিচ্ছিন্ন ভাবনা আচ্ছন্ন করে রাখে আমার সমস্ত সত্তা। কিন্তু এই অবিচ্ছিন্ন চিন্তা কি মুক্তির পথ দেখাবে না?

কর্মক্লান্ত এই জীবন সায়াহ্নে পথ পরিক্রমার দুপাশের কত অযুত ভাবনা—তার সব কি বলা সম্ভব? না—বলা যায়?

শরৎ চন্দ্রের শ্রীকান্তের কথাই আজ মনে পড়ে, আমার ভবঘুরে জীবনের সন্ধ্যায় দাঁড়াইয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।

পাঠকের দ,ষ্টিতে
'সমাজ কল্যাণ'

পত্রিকার নাম 'সমাজ কল্যাণ, সমাজ কল্যাণ বিভাগ, ৭৪, বিজয় নগর, ঢাকা, প্রকাশনা শাখা হতে প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদটা থেকে শুরু করা যাক। প্রচ্ছদ পটের মার্চ–এপ্রিল সংখ্যার বিষয় ছবির বিষয়বস্তু অত্যন্ত পুরানো। যা দেখলে দৃষ্টি শক্তি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সৃষ্টি হয় পাঠক পাঠিকার মনে হতাশার গভীর যন্ত্রণা। প্রচ্ছদপটের কালার মিশ্রণ ও পরিস্ফুটন সম্বন্ধে বলতে হলে বলতে হয় সদ্য বিবাহিতা নারীর স্বামী হারানো চেহারার মতই বিমর্ষ। প্রচ্ছদপটের অঙ্গ সজ্জা বৈরাগ্যতার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই বহন করে না। সূচীপত্র পাতাটির সজ্জা দেখলে পেতে হয় লজ্জা। মার্চ–এপ্রিল, '৮২ ইং সংখ্যায় এই পাতাটির উপরে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের একটি কবিতার অংশ বিশেষ সংকলিত করে ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কবিতাটির অংশ বিশেষ পত্রিকার অন্য কোন পাতায় সুন্দরভাবে স্থান দেওয়া যেতো। অধুনা তরুণ বখাটেরা যেমন হিপ্পী সেজে নাকের আগায় চশমা লাগিয়ে থাকে, ঠিক তেমনি কবিতার অংশ বিশেষ স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে সেই ধরণের পরিচয়ই দেওয়া হয়েছে। লেখার ব্যাপারে মার্চ–এপ্রিল' ৮২ সংখ্যার কোহিনুর বেগমের লিখিত 'পুষ্টি হীনতা কেন?' অত্যন্ত মূল্যবান রচনা। সাম্প্রতিক কালের চাহিদা অনুযায়ী এই ধরণের লেখা প্রশংসার দাবী রাখে নিঃসন্দেহে। তবুও এই লেখাটিতে কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য বা বিশ্লেষণ থাকলে আরও সুন্দর ও স্বার্থক হতো। কোহিনুর বেগম এই প্রবন্ধটি লিখে পুষ্টিহীনতায় রোগাক্রান্ত 'সমাজ কল্যাণ' মুখপত্রটির কিছুটা অপুষ্টির দুর্নাম হ'তে রক্ষার চেষ্টা করেছেন। এই জন্য তিনি ধন্যবাদের যোগ্য। এই ব্যাপারে সাহেরা আহমদও কৃতিত্বের দাবীদার। তার লিখিত Prevention of Prostitution প্রবন্ধটি সত্যই প্রশংসনীয়। প্রবন্ধটির ইংরেজীর দক্ষতার ফলে পাঠকদের নিকট হৃদয়গ্রাহী করে তুলবে। এ কথা বললে নিশ্চয়ই ভুল বলা হবে না যে এই দুই লেখিকাই এই সংখ্যার মুখপত্রটির পুষ্টি বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ মৃত্যু পথের যাত্রীকে যেমন ডাক্তার স্যালাইন বা অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। তেমনি কোহিনুর বেগম ও সাহেরা আহমদ উক্ত দুটি প্রবন্ধ রচনা করে পত্রিকাটির ন্যূনতম মান রক্ষার চেষ্টা করেছেন। তবুও শেষ চেষ্টায় শেষ রক্ষা হয়েছে কি? এই বিচারের ভার পাঠকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো। এ ছাড়া মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম রচিত 'উপযোগিতার প্রেক্ষাপটে চিকিৎসা সমাজ কর্ম' প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু অত্যন্ত ভাল। তবে তিনি তার লেখায় তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হয়েছেন। লেখার বিষয়বস্তু মৌলিকত্ব থেকে বেশ দূরে সরিয়ে রেখেছেন, পাঠকদেরকে নিজের মনেরই অজান্তে। এর পর রয়েছে লেখার অসংলগ্নতা যেমন চিকিৎসা সমাজ কর্মের ইতিহাসটি আরো সুন্দর ও ব্যাপক ভাবে প্রকাশ ঘটানোর প্রয়োজন ছিল। এই প্রসংগটি প্রবন্ধের প্রথমার্ধের অংশে আসলে আরো সুশৃংখল হতো। তদুপরি প্রবন্ধের বাক্য গঠন অত্যন্ত দীর্ঘ এবং শব্দের ব্যবহার প্রাচীন। প্রবন্ধটির নামকরণ আরো সহজ ও সংক্ষিপ্ত হলে ভাল হতো নয় কি? লেখক প্রবন্ধের তৃতীয় পাতায় অহেতুক ভাবে বাংলাদেশের চিকিৎসা সমাজ ৩৮ টি প্রকল্পের দীর্ঘ খতিয়ান পেশ করে পত্রিকার পাতা ভরেছেন। অবশ্য পাতা ভরা যদি উদ্দেশ্য থাকে, তবে তাতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। লেখক অবশ্য এই দীর্ঘ খতিয়ান না লিখে অন্যভাবে লেখার মাধ্যমে ত্রুটি এড়িয়ে যেতে পারতেন অতি সহজে। তবুও লেখকের লেখার প্রচেষ্টা অত্যন্ত সাহসের দাবী রাখে। মোঃ ছিদ্দিকীর স্বনির্ভর কবিতাটি অত্যন্ত নিম্নমানের। সম্পাদিকা দেখে শুনে এই ধরণের কবিতা কিভাবে নির্বাচিত করলেন, তাই ভেবে অবাক হয়ে যাই। তবেকি তিনি জেনে শুনে বিষ করেছেন পান? 'আলোর অন্বেষা'র বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছু না বললে এ লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই ধরণের সংযোজন অত্যন্ত গৌরব-জনক তো বটে এবং এতে সম্পাদিকার প্রখর বুদ্ধির প্রশংসা না করলে তার উপর ভীষণভাবে অন্যায় করা হবে। করা হবে অবিচার। 'সত্য সন্ধানীর' অবিষ্কার জুতা পালিশওয়ালা আলম। এই আবিষ্কার অত্যন্ত চমকপ্রদ। সমাজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এই ধরণের আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের চেয়ে কোন অংশেই খাটো নয়। 'সত্য সন্ধানী'র এই প্রচেষ্টা শুধু মহৎই নয়, তারচেয়ে আরো বেশী কিছু, সত্য সন্ধানীর এ মহৎ প্রচেষ্টার জন্য সাধুবাদ জানাতে হয়। বলতে হয় 'সত্য সন্ধানীর সন্ধানী দৃষ্টির জয় হউক। সম্পাদকীয় আরো সুসংহত হওয়া প্রয়োজন। সম্পাদকীয় বিষয়বস্তুর প্রকাশ সূর্যের আলোর মত প্রখর হতে হবে। একই শব্দের পুনরাবৃত্তি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলাই ভাল। সম্পাদকীয় গুরুতার শব্দের ভারে ভারাক্রান্ত। পত্রিকাটিতে আরো কিছু সংযোজন থাকলে শ্রীবৃদ্ধি হতো। যেমন সংযোজন করা যেতে পারে চিঠি-পত্র বিভাগ, গল্প, কবিতা, সাক্ষাৎকার, চলচ্চিত্র ধর্ম বিভাগ ইত্যাদি। প্রসংগক্রমে উল্লেখ্য আগামীতে পত্রিকাটির মান উন্নয়ন দেখার আশা এবং মাননীয়া সম্পাদিকাকে অশেষ ধন্যবাদ জানানোর সুযোগের অপেক্ষায় রয়ে বিদায় নিচ্ছি। মাননীয়া সম্পাদিকা সে সুযোগ করে দিবেন, তা তিনিই জানেন।

১-৯-৮২ ঢাকা—সোহরাব আহম্মদ ছিদ্দিকী
জি, পি (প) ১০৩, দক্ষিণ বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা

বাঃসঃমুঃ-৮২/৮৩-৩০৪৭এইচ-১৫০০-১৯৮৩।